# ভারত কথা

দীপক কুমার দত্ত

৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

# সূচীপত্র

# কর্তব্যনিষ্ঠার পরীক্ষা

সরল সুবোধ সুদর্শন বালক উপমন্যু। জ্ঞানার্জনের জন্য এসেছে গুরুগৃহে। গুরুদেব তাকে আদেশ করলেন, 'সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন চারণ-ভূমিতে তুমি আমার গরুর পাল নিয়ে ঘুরবে। এই তোমার কাজ, উপমন্যু।'

গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বালক উপমন্যু বললেন, 'আপনার
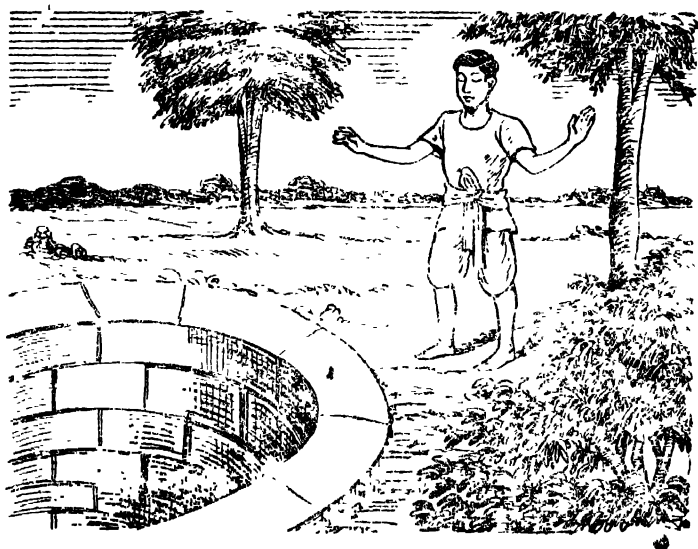
আদেশ পালনে আমার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হবে না। আপনার আশীর্বাদে আমি অসাধ্য কর্মও সাধন করতে পারি।'

প্রত্যূষে গরুর পাল নিয়ে ভগবানের নামগান করতে করতে চারণ-ভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হয় উপমন্যু। সূর্য অস্ত গেলে ফিরে আসে

ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে। এইভাবেই গুরুর নির্দেশ পালন করে চলে বালক উপমন্যু।

উপমন্যুর আহারের ব্যবস্থা গুরুদেব করে দিলেন না। কিন্তু তিনি দেখলেন, উপমন্যু পূর্বের মতোই সুস্থ ও সবল। একদিন তিনি উপমন্যুকে কাছে ডেকে বললেন, 'বৎস তোমাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখছি। কোথা থেকে কিভাবে আহার সংগ্রহ কর?'

বিনীতভাবে উপমন্যু উত্তর করল, 'আমি চারণ-ভূমিতে গরুর পাল রেখে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে আমার আহার সংগ্রহ করি। ভিক্ষান্নেই আমার দিন অতিবাহিত হয়, গুরুদেব।'

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন গুরুদেব। বললেন, 'ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের জন্য তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। আজ থেকে তুমি আর ভিক্ষা করবে না।'

গুরুদেবের চরণে নত হয়ে উপমন্যু বলল, 'আপনার আদেশ পালন করাই আমার প্রধান কর্ম। আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করব।' এই বলে সে নিজের কাজে চলে গেল।

দিন যায়। গুরুদেব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, উপমন্যুর স্বাস্থ্যের অবনতি তো হয়ই নি, বরং পূর্বাপেক্ষা তার স্বাস্থ্য উন্নত। গুরুদেব আবার তাকে ডাকলেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ছিঃ, ছিঃ, উপমন্যু, তুমি এখনো ভিক্ষা করছ? তোমাকে ধিক!'

বিনীতভাবে উপমন্যু বলল, 'কই, আমি তো আর ভিক্ষা করিনে, গুরুদেব। আপনার আদেশ পালনে এতটুকু শৈথিল্য আমার মধ্যে নেই।'

গুরুদেব গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে এমন উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী তুমি কিভাবে হলে?'

উপমন্যু উত্তর দিল, 'আমি একটা গরুর দুধ পান করে থাকি।'

ক্রুদ্ধস্বরে গুরুদেব বললেন, 'গো বৎসকে বঞ্চিত করে গো-দুগ্ধ পান করছ তুমি! তুমি এমন হৃদয়হীন তা তো জানতাম না। যাও, এমন ধরনের কাজ আর কখনো করবে না।'

গুরুদেবকে প্রণাম করে উপমন্যু চলে গেল।

এরপর থেকে অনাহারেই উপমন্যুর দিন কাটতে লাগল। কয়েক দিন অনাহারের ফলে উপমন্যুর শরীর ভেঙে গেল। চলাফেরা ও গরুর পাল দেখাশুনা করার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল সে। ক্ষুধায় কাতর হয়ে সে একদিন বাধ্য হয়ে এক ধরনের বিষাক্ত ফল খেয়ে ফেলল। ফলে সে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলল।

উপমন্যুর কষ্টের আর সীমা রইল না। সে গুরুগৃহে যাত্রা করল। পথ চলতে চলতে সে বহুবার হোঁচট খেল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে আঘাতও খেল। এক সময় সে পথ হারিয়ে ফেলল। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে জলশূন্য একটা কূপের মধ্যে পড়ে গেল।

অন্ধ উপমন্যুর শীর্ণ বেদনাজর্জর দেহ কূপের মধ্যে অসহায় অবস্থায় পড়ে রইল। সে বুঝল মৃত্যু তার অবধারিত। সে মনে মনে ভগবানের নাম জপ করতে লাগল।

হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল সে। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে! সে বুঝল, গুরুদেব তাকে ডাকছেন। ক্ষীণস্বরে সে সাড়া দিল, 'আমি এখানে কূপের মধ্যে, গুরুদেব।'

গুরুদেব উপমন্যুর সাক্ষাৎ না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। কূপের মধ্য থেকে উপমন্যুকে উদ্ধার করলেন তিনি। গুরুদেব এত দিন উপমন্যুকে পরীক্ষা করছিলেন। উপমন্যু প্রকৃত বিশ্বস্ত ও কর্তব্যপরায়ণ কিনা তা জানাই ছিল গুরুদেবের উদ্দেশ্য। তিনি তাঁর

প্রতিটি শিষ্যকে নানাভাবে পরীক্ষা করতেন। আজ তিনি বুঝলেন, উপমন্যু প্রকৃত বিশ্বস্থ ও কর্তব্যপরায়ণ শিষ্য। উপমন্যুর মতো বালক তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দুর্লভ।

তিনি উপমন্যুকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। উপমন্যু গুরুর আশীর্বাদে ফিরে পেল দৃষ্টিশক্তি এবং সেই মুহূর্ত থেকেই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হলো সে।

# গুরুর জন্য কষ্ট স্বীকার

শিষ্যের জানুতে মাথা রেখে ক্লান্ত পরশুরাম নিদ্রামগ্ন। স্থির হয়ে বসে রইলেন শিষ্য। গুরুদেব শিষ্যের জানুতে মাথা রেখে বিশ্রাম করছেন, এতবড় সৌভাগ্য কজন শিষ্যের জীবনে ঘটে! আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে শিষ্যের অন্তর।

হঠাৎ শিষ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন। একটা ভীষণ কীট তাঁর জানুর নীচে এসে দংশন করতে আরম্ভ করেছে। তাঁর মনে হল, যেন শত সহস্র বৃশ্চিক এক সঙ্গে তাঁকে দংশন করছে। কিন্তু

পাছে গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে অচঞ্চল হয়ে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করতে থাকেন তিনি। ভীষণ কীট জানুর মাংস ভেদ করে গুরুদেবের কণ্ঠ স্পর্শ করল।

চমকে উঠে বসলেন পরশুরাম। কণ্ঠে হাত দিয়ে ভীত হয়ে উঠলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'রক্ত এল কোথা থেকে ?'

শিষ্য বললেন, 'আমার জানুর রক্ত আপনার গলদেশে লেগেছে। ঐ ভীষণ কীট আমার জানুর মাংস ভেদ করেছে।'

শিহরিত হলেন পরশুরাম। বললেন, 'ও যে বজ্রকীট! এই মারাত্মক কীটের দংশন তুমি নীরবে সহ্য করেছ! ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কেউ তো এ যন্ত্রনা সহ্য করতে পারে না!' শিষ্যের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করলেন, ,তুমি তো ব্রাহ্মণ নও যুবক, তুমি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়।'

শিষ্য বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার শিষ্য, আপনার দাসানুদাস।'

পরশুরাম ক্রোধভরে বললেন, 'সত্য বল, তুমি কে ?

শিষ্য নত হয়ে বললেন, 'আমি সূতপুত্র। আপনি ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাউকে অস্ত্রশিক্ষা দেন না বলে আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, গুরুদেব।' গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করলেন শিষ্য।

পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের দেখতে পারতেন না। ক্ষত্রিয়েরা তাঁর মহাশত্রু, আর তাদের বিনাশ করাই তাঁর ধর্ম।

শিষ্যের কথা পরশুরাম বিশ্বাস করলেন না। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কিছু নও। ঐ বজ্রকীটের দংশন সহ্য করার শক্তি সূতপুত্রের নেই। আমি তোমাকে অভিশাপ দেব।'

কম্পিত হলেন শিষ্য। নতমস্তকে বললেন, 'দয়া করুন, গুরুদেব! শান্ত হোন, আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হোন। আমি হীন সূতপুত্র। অভিশাপ দিয়ে আমাকে হীনতর করে ফেলবেন না।'

পরশুরাম বললেন, 'যদি তুমি সূতপুত্র হও, তবে আমার অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। আর যদি ক্ষত্রিয় হও, তবে আমার অভিশাপে তোমাকে শাস্তিভোগ করতেই হবে। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, 'বিপদকালে আমার প্রদত্ত শিক্ষা তুমি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হবে।'

এই শিষ্যের নাম কর্ণ। ইনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ক্ষত্রিয়। নিজের পরিচয় প্রথম জীবনে তিনি অবগত ছিলেন না। ইনি ছিলেন দানবীর ও মহাযোদ্ধা। কুরুক্ষেত্র সমরে এতবড় বীর আর কেউ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু গুরুদেবের অভিশাপই তাঁর পতনের কারণ হয়।

—০—

# অদ্ভুত আজ্ঞাবহ

এক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ সাধকের কাছে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা আসতেন শিক্ষালাভের জন্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যই ছাত্ররা বিশেষ করে ব্রাহ্মণের কাছে আসতেন।

একপাল গরু ও কিছু কৃষিযোগ্য ভূমি ব্রাহ্মণের ছিল। তিনি আরুণি নামে এক শিষ্যকে তাঁর গরুর পাল ও ভূমির তত্ত্বাবধায়ক

নিযুক্ত করেন। মহাআনন্দে ভক্তিভরে সেই দায়িত্ব পালন করত আরুণি। প্রত্যুষে সে বেরিয়ে যেত গরুর পাল নিয়ে। ভূমির তত্ত্বাবধানের কাজও ফাঁকে ফাঁকে চলত। সূর্য অস্ত গেলে ফিরে আসত গরুর পাল নিয়ে।

অনেকে ভাবত, আরুণি তো সারাদিন মাঠেই পড়ে থাকে, গো-সেবা করেই তো তার সময় চলে যায়, বিদ্যাভ্যাস সে কখন করে? কিন্তু আরুণির মনে সে রকম কোনো প্রশ্ন জাগে না। সে ভাবে,

গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী গো-সেবা আর কৃষিকার্য দেখাশুনা করাই তার শিষ্য জীবনের একমাত্র ব্রত। এই কাজের মধ্যেই সে খুঁজে পেত গভীর আনন্দ।

দিন যায়।

এল বর্ষাকাল।

ব্রাহ্মণের জমিতে প্রচুর জল দরকার। জমির চারপাশে বাঁধ দেওয়া হয়েছে।

একদিন খবর এল বাঁধের একস্থানে ফাটল দেখা দিয়েছে। জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ডাক পড়ল আরুণির। গুরুদেব বললেন, 'আরুণি, জমির জল একটা ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি দ্রুত গিয়ে সেই ফাটল বন্ধ করার ব্যবস্থা কর।'

গুরুদেবের আদেশ। আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। আরুণি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। জমির সেই ফাটল মাটি দিয়ে বন্ধ করতে বারবার চেষ্টা করল। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ। হঠাৎ জলের তোড়ে বাঁধের খানিকটা অংশ গেল ভেঙে। কি করলে জল রুদ্ধ করা যায়, ভেবে পেল না। মাটি দিয়ে জল ধরে রাখবার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেল।

তার দুটি চোখ বেয়ে দরদর ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে বুক তার যেন ফেটে যেতে লাগল। মনে মনে বলল, 'গুরু-আজ্ঞা কি পালন করতে আমি পারব না? গুরুদেব, বলে দিন, এখন আমার কি কর্তব্য? আমাকে শক্তি দিন, আমাকে বুদ্ধি দিন।'

সহসা আরুণি চীৎকার করে উঠল, 'পেয়েছি।' এই বলেই বাঁধের ভাঙা অংশে শুয়ে পড়ল। এবার রুদ্ধ হল জলের গতি। তার দেহই বাঁধের কাজ করল।

দুপুর গড়িয়ে যায়। আরুণি সেই ভাবেই পড়ে থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার সর্বশরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু উপায় নেই। গুরু-আজ্ঞা পালন করাই যে তার ব্রত।

বিকেল আসে। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে। এক সময় সূর্য অস্ত গেল। আরুণি একইভাবে শুয়ে জমির জলের গতি রুদ্ধ করে রেখেছে।

মাঠ থেকে গরুর পাল ব্রাহ্মণের গৃহে ফিরে গেছে। হঠাৎ ব্রাহ্মণের খেয়াল হল, আরুণি তো এখনো ফেরে নি! তিনি চিন্তিত হলেন। শিষ্যদের নিয়ে তিনি উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে বের হলেন আরুণির সন্ধানে।

মাঠে গিয়ে এদিক ওদিক খুঁজলেন আরুণিকে। ডাক দিলেন, 'আরুণি, আরুণি।' গুরুদেবের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর বাতাসে বহুদূর ভেসে গেল।

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

এবার সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন তিনি, 'বৎস আরুণি, কোথায় তুমি?'

কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠের উত্তর ভেসে এল বাতাসে, 'এই যে আমি, গুরুদেব।'

ব্রাহ্মণ সেই স্বর লক্ষ্য করে গিয়ে দেখেন, আরুণি তার শরীর দিয়ে জমির জল আটকে রেখেছে। আনন্দে, দুঃখে ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হল। আরুণির জলসিক্ত কর্দমময় দুর্বল ক্লান্ত দেহটাকে বুকে তুলে নিলেন ব্রাহ্মণ। বললেন, 'তুমিই আমার প্রকৃত শিষ্য, আরুণি। তুমি আমার গর্ব, তুমি আমার আনন্দ। আমি আশীর্বাদ করি, তুমি একদিন মহাজ্ঞানী সাধক হবে।'

# একাগ্র মনের জয়

আচার্য দ্রোণ তাঁর চারজন শিষ্য নিয়ে এক প্রান্তরে এসে দাঁড়ালেন। এই চারজনের মধ্যে তিনজন পাণ্ডব রাজকুমার—যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন এবং অন্যজন কৌরব রাজকুমার—দুর্যোধন। কিছু দূরের এক বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ঐ বৃক্ষের পত্ররাজির মধ্যে কি দেখছ?'

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'একটি সুন্দর পক্ষী বৃক্ষের পত্ররাজির মধ্যে দেখছি 'গুরুদেব।'

দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর পক্ষীর নিকটে কি দেখতে পাচ্ছ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'বৃক্ষের পত্ররাজি আর শাখা-প্রশাখা দেখতে পাচ্ছি।'

দ্রোণ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পাশে আর কি দেখছ ?

যুধিষ্ঠির সরল মনে উত্তর দিলেন, 'গুরুদেব, আপনাকে আর আমার ভাইদের দেখতে পাচ্ছি।'

বিরক্ত হয়ে দ্রোণ বললেন, 'তুমি যাও, আমার শিক্ষা তোমাকে লাভবান করতে পারেনি।'

তারপর দ্রোণ দুর্যোধনকে আহ্বান করলেন। বললেন, 'তুমি ঐ গাছে কি দেখতে পাচ্ছ, দুর্যোধন ?'

যুধিষ্ঠিরের মতোই দুর্যোধন উত্তর দিলেন, 'বৃক্ষে একটি পক্ষী দেখতে পাচ্ছি।'

—'আর পক্ষীর সন্নিকটে কি দেখতে পাচ্ছ ?'

—'বৃক্ষের পত্র ও শাখা-প্রশাখা দেখছি।'

—'পাশে আর কি দেখতে পাচ্ছ, দুর্যোধন ?'

—'কই, আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

এবারও বিরক্ত হলেন দ্রোণাচার্য। বললেন, 'যুধিষ্ঠিরের তুলনায় তুমি একটু বেশী অগ্রসর হলেও এখনও তোমার শিখতে অনেক কিছুই বাকি। তুমি যাও।'

এবার গুরুদেবের আহ্বানে এগিয়ে এলেন ভীম। গুরুদেবের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'বৃক্ষের পত্রসমূহের মধ্যে একটি পক্ষী দেখতে পাচ্ছি।

দ্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'পক্ষীর সন্নিকটে আর কি দেখছ, ভীম ?'

ভালোভাবে লক্ষ্য করে ভীম দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'পক্ষীটি ছাড়া আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না, গুরুদেব।'

—'কেন, পত্র, শাখা-প্রশাখা এবং আমাদিগকে কি দেখতে পাচ্ছ না, ভীম ?'

পূর্বের মতো দৃঢ়কণ্ঠে ভীম বললেন, 'না গুরুদেব, আর কিছুই আমার দৃষ্টিতে পড়ছে না।'

দ্রোণ আবার প্রশ্ন করলেন, 'পক্ষীটির কতটুকু দেখতে পাচ্ছ ?'

—'আমি সম্পূর্ণ পাখিটা দেখতে পাচ্ছি। পক্ষীটির দেহ, মাথা, ডানা, পা দেখতে পাচ্ছি।'

দ্রোণ কিছুটা বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তুমিও যথার্থ উপযুক্ত হয়ে ওঠ নি। তোমার শিক্ষা এখনো অসম্পূর্ণ। তুমি যাও।'

এবার অর্জুনকে পরীক্ষার পালা। দ্রোণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অর্জুন, তুমি ঐ গাছে কি দেখতে পাচ্ছ ?'

—'আমি পক্ষী দেখতে পাচ্ছি, গুরুদেব।'

—'পক্ষীটির নিকটে অন্য কিছু কি দেখতে পাচ্ছ ?'

অর্জুনের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি উত্তর দিলেন, 'আর আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।'

গুরুদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৃক্ষের পত্ররাজি, শাখা-প্রশাখা, আমাকে, তোমার ভ্রাতাদিগকে কি দেখতে পাচ্ছ না ?'

অর্জুন পূর্বের মতো উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'না, গুরুদেব আমি কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।'

—'পক্ষীটির কতটুকু দেখছ, অর্জুন ?'

—'পক্ষীটির মাথাটি দেখতে পাচ্ছি, গুরুদেব।'

দ্রোণের অন্তর আনন্দে ভরে গেল, তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'পক্ষীটির মাথার কতটুকু অংশ তোমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, অর্জুন ?'

অর্জুন উত্তর দিলেন, 'কেবলমাত্র পক্ষীটির চোখ আমি দেখতে পাচ্ছি।'

দ্রোণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বুঝলেন, অর্জুন প্রকৃত

শিক্ষা লাভ করেছে। তিনি পক্ষীটির চক্ষু শরবিদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন।

অর্জুন শরদ্বারা বিদ্ধ করলেন পক্ষীটির চক্ষু।

দ্রোণ আনন্দিত চিত্তে বললেন, 'তোমার শিক্ষা সার্থক, বৎস। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর হিসাবে জগতে খ্যাতিলাভ করবে।'

দ্রোণ ছিলেন কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের শিক্ষাগুরু। তাঁর অধীনে রাজকুমারগণ নানাপ্রকার অস্ত্র শিক্ষালাভ করেছিলেন। দ্রোণ তাঁদের প্রকৃত মানুষরূপে ও যোদ্ধারূপে গড়ে তুলতে পরিশ্রম করেছিলেন। চারজন রাজকুমারের মধ্যে কে কতটা অস্ত্রশিক্ষায় নৈপুণ্য লাভ করেছেন, তা জানবার জন্য তিনি একটি কৃত্রিম পক্ষী নির্মাণ করে একটি বৃক্ষে স্থাপন করেছিলেন এবং রাজকুমারদিগকে সেখানে এনে পরীক্ষা করেছিলেন।

অর্জুনের সাফল্যের মূল কারণ সন্ধান করতে গিয়ে অন্য তিনজন রাজকুমার বুঝলেন, সফলতার মূল মনের একাগ্রতা। সর্ব কার্যেই একাগ্র মনের জয়।

—০—

# গুরুদক্ষিণা

একদিন দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদান করছেন, এমন সময় একজন অপরিচিত যুবক সেখানে এসে উপস্থিত। যুবকটি সুদর্শন ও দীর্ঘদেহী। সে দ্রোণাচার্যের সম্মুখে নত হয়ে বলল, 'প্রভু, আপনার

খ্যাতি বিশ্বময়। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করে নিন।'

দ্রোণাচার্য আর্য ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য কাকেও শিক্ষা দেন না। তিনি বুঝলেন, যুবকটি অনার্যশ্রেণীভুক্ত। তিনি অসম্মত হলেন। বললেন, 'তুমি ফিরে যাও, যুবক। অনার্যসন্তান আমার শিষ্য হওয়ার অনুপযুক্ত।'

যুবকটি মিনতিভরা কণ্ঠে বলল, 'আমাদের জাতির যিনি অধিপতি

আমি তাঁরই সন্তান। সুতরাং সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানকে শিক্ষাদান করতে আপনি নিশ্চয়ই অসম্মত হবেন না।'

দ্রোণাচার্য বিরক্ত হলেন। বললেন, 'এমন অসঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি ফিরে যাও, যুবক।'

সবিনয়ে বার বার প্রার্থনা জানাল যুবকটি। কিন্তু দ্রোণাচার্য আপনার সিদ্ধান্তে অটল।

ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেল যুবকটি। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। সে কি সত্যিই ঘৃণার পাত্র? সামান্য কুকুরের মতো তাকে ফিরিয়ে দিলেন বীরচূড়ামণি আচার্য দ্রোণ।

কিন্তু দ্রোণাচার্যের কাছে অনাদৃত হলেও যুবকটি তাঁকেই মনে মনে গুরু নির্বাচন করলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি যেমন করেই হউক ধনুর্বিদ্যায় নৈপুণ্য অর্জন করব।'

তারপর অনেকদিন চলে গেছে।

একদিন দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নগর ছাড়িয়ে ভ্রমণ করতে গেলেন। অরণ্য-পথে চলতে চলতে তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন। একটি কুকুরের মুখ শরদ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছে। কুকুরটি চীৎকার করতে পারছে না, মুখ খুলতেও পারছে না। তাঁরা আরো লক্ষ্য করলেন, কুকুরটির মুখ থেকে বিন্দুমাত্র রক্তপাত হয়নি অথবা কুকুরটি যন্ত্রণায় কাতরও হয়নি। দ্রোণাচার্য ও তাঁর শিষ্যদের বিস্ময়ের অবধি রইল না।

দ্রোণাচার্য শিষ্যদের বললেন, 'যে ব্যক্তি ঐ শর নিক্ষেপ করেছেন তিনি যে একজন মস্ত বড় ধনুর্দ্ধর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমন আশ্চর্যজনক কৌশল আমি পূর্বে দেখিনি। চল দেখি এমন ধনুর্বিদ্যা বিশারদ কে খুঁজে বের করা যাক।'

খুঁজতে খুঁজতে দ্রোণাচার্য গভীর অরণ্যে চলে গেলেন। এক জায়গায় দেখলেন, বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কৃত। একপার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি কুটীরের সম্মুখে একটি মূর্তি স্থাপিত। সেই মূর্তির সম্মুখে একটি যুবক ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করছে। দ্রোণাচার্য অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, মূর্তিটি স্বয়ং তাঁর এবং ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসরত যুবকটি হল সেই ব্যক্তি যে কিছুকাল পূর্বে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্য গিয়েছিল। তাহলে এই সেই ধনুর্ধর যে কুকুরের মুখ আশ্চর্যভাবে শরের দ্বারা বিদ্ধ করেছে! দ্রোণাচার্য ও শিষ্যগণ শুধু বিস্মিতই হলেন না, মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন যুবকটিকে।

দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিভাবে এই ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত করেছ? কে তোমাকে এই বিদ্যায় এমন পারদর্শী করে তুলেছে?

যুবকটি বলল, 'আপনিই আমার একমাত্র শিক্ষক, একমাত্র গুরুদেব। আপনার নিকট থেকেই আমি এই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছি। আপনার মূর্তি এখানে স্থাপন করে আমি নিয়মিত ধনুর্বিদ্যা চর্চ্চা করে চলেছি। সর্বক্ষণ মনে করি আপনিই অদৃশ্য থেকে আমাকে এই বিদ্যা দান করছেন। আপনার করুণাতেই আমি এই যৎসামান্য বিদ্যা অর্জন করেছি।'

দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য অর্জুন। কিন্তু অর্জুনও ধনুর্বিদ্যায় এতখানি পারদর্শিতা লাভ করতে পারেননি। একজন অনার্য ধনুর্বিদ্যায় আর্য ক্ষত্রিয়কেও অতিক্রম করে যাবে, এ ব্যাপার দ্রোণাচার্য সহ্য করতে পারলেন না। এক অভিসন্ধি জাগল তাঁর মনে। যুবকটিকে বললেন, 'আমি যদি তোমার অস্ত্রশিক্ষাগুরু হই, তবে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে গুরু-দক্ষিণা দিতে প্রস্তুত আছ।'

সহজ সরল যুবকটি বলল, 'আমি গুরুদক্ষিণা দেবার জন্য প্রস্তুত গুরুদেব। আপনার ইচ্ছামতো দক্ষিণা দিব।'

দ্রোণাচার্য কুটিল হাসি হেসে বললেন, 'তুমি তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ দাও।'

যুবকটির মুখের বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটল না। অবিচলিত চিত্তে সে তরবারি নিয়ে এক আঘাতে বৃদ্ধাঙ্গুলটি ছিন্ন করে দ্রোণাচার্যের চরণে নিবেদন করল।

এই যুবকটির নাম একলব্য। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করল সে। পৃথিবী হারাল তার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর সন্তানকে।

---

# বিশ্বনাথের কৃপা

ফাঁকির দ্বারা কোনোদিন মহৎ কাজ সাধিত হয় না। কোনো বিষয়ে কৃতকার্য হ'তে গেলে প্রয়োজন পরিশ্রমের। ইচ্ছার সঙ্গে পরিশ্রম যুক্ত হলেই উন্নতি। যে গান শিখতে ইচ্ছুক, সে যদি তানসেনের মূর্তির সামনে দিনরাত বসে থাকে গান শেখা তার পক্ষে কোনোদিনই হবে না। একজন সংগীতজ্ঞের অধীনে থেকে তাঁর

নির্দেশ সেই ব্যক্তি যদি যথাযথ পালন করে, নিয়মিত সাধনা করে, তবেই সে একদিন সত্যকার গায়ক হয়ে উঠতে পারে। ডাঙায় বসে কেউ কোনদিন সাঁতার শিখতে পারে না।

বেদ হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ। বেদ মানুষের লেখা নয়, এ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। যখন বেদগ্রন্থ রচিত হয়নি, তখন ঋষিদের কণ্ঠে

বেদ-বাণী প্রচারিত হত। শিক্ষার্থীরা ঋষিদের মুখ থেকে এইসব পবিত্রবাণী শুনে মুখস্থ করতেন। তাঁরা বেদ-স্তোত্র আবৃত্তি করতেন, ঋষিদের মুখ থেকে শুনে বেদ-অভ্যাস করা হ'ত বলে বেদের আর এক নাম ছিল শ্রুতি। সেই যুগে বেদশিক্ষা ছিল বাস্তবিকই সাধনা-সাপেক্ষ। একমাত্র বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়ীদেরই পক্ষে বেদশিক্ষা সম্ভব ছিল।

পুণ্যতীর্থ কাশীধাম সেযুগে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চার সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। একবার এক যুবক এল কাশীধামে বেদশিক্ষার জন্য। গুরুদেব যুবকটিকে বেদজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। যুবকটি বেদজ্ঞান অর্জনের জন্য এক উপায় খুঁজে পেয়েছে। অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও মনের একাগ্রতা নিয়ে গুরুগৃহে বেদ-অভ্যাসের মতো বিরক্তি ও যন্ত্রণা আর কিছু হতে পারে না বলে যুবক মনে মনে ধারণা করল।

কাশীধামে বিশ্বনাথের মন্দিরে যুবকটি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান-শেষে গিয়ে পূজা দিত। মহাদেব বিশ্বনাথ তাঁর বহু ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। যুবকের ধারণা তার মনোবাসনাও বিশ্বনাথ একদিন অবশ্যই পূর্ণ করবেন। বিশ্বনাথ কৃপা করলে সব কিছুই সম্ভব।

দিন যায়। মাস যায়। বৎসরের পর বৎসর যায়। কিন্তু যুবকটি সামান্য বেদ-জ্ঞানও আয়ত্ত করতে পারল না। বিশ্বনাথের কৃপা সে লাভ করল না।

মহাদেব বিশ্বনাথ তাঁর এই যুবক ভক্তটিকে স্নেহ করতেন। কিন্তু তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারলেন না। কারণ জগতে কাজ না করে কিছু পাওয়া যায়না। কর্মহীন চিন্তা বা বাসনা অর্থহীন।

যুবকটিকে উন্নতির প্রকৃত পথ দেখাবার জন্য বিশ্বনাথ এক ভবঘুরের রূপ ধারণ করলেন।

প্রভাতে গঙ্গায় প্রতিদিনের মতো স্নান করছে যুবকটি। সে কৌতূহলের সঙ্গে দেখল এক ভবঘুরে গঙ্গার জলে ঢিল ফেলছে। যুবকটি যতক্ষণ স্নান করল ততক্ষণ ধরে ঐ ব্যাপার লক্ষ্য করল।

পরদিন ভবঘুরেকে আবার দেখা গেল। সে আগের দিনের মতোই ঢিল ছুঁড়ছে জলে। যুবকটি নিশ্চয়ই উন্মাদ।

তার পরের দিন আবার সেই দৃশ্য।

দিনের পর দিন যুবকটি সেই একই দৃশ্য দেখল।

বিপুল কৌতূহল ও বিস্ময় নিয়ে যুবকটি একদিন ভবঘুরেকে জিজ্ঞাসা করল, প্রতিদিন তুমি গঙ্গার জলে ঢিল ফেল কেন?

ভবঘুরে অদ্ভুত উত্তর দিল, 'গঙ্গার বুকে সেতু নির্মাণ করতে চাই। ঢিল ফেলে ফেলে গঙ্গার বুকে সেতু নির্মাণ করব।

যুবকটি অট্টহাসি হেসে বলল, সেতু নির্মাণের কারণ কি?

ভবঘুরেটি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'ওপারে যাওয়া আমার বিশেষ দরকার।'

যুবকটি আবার অট্টহাসি হাসল। বলল, 'তোমার মতো পাগল আর বোকা তো আমি কোনোদিন দেখিনি। ঢিল ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই তো জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে আর গলেও যাচ্ছে। সেতু নির্মাণ কি এইভাবে সম্ভব?

ভবঘুরে বলল—'কেন সম্ভব নয়? কাশীতে একজন যুবক বহুদিন হল এসেছে বেদ শিক্ষার জন্য। সে নিয়মিত বেদ অভ্যাস না করে বিশ্বনাথের পূজা করছে। সে যদি বিশ্বনাথের পূজা করলে

বেদজ্ঞান লাভ করতে পারে তবে আমিও ঢিল ফেলে গঙ্গার বুকে সেতু নির্মাণ করব! এই বলেই ভবঘুরেটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতদিন পরে যুবকটি তার ভুল বুঝতে পারল। পরিশ্রম না করলে পাওয়া ঘটে না! বিশ্বনাথের কৃপা অধ্যবসায়ীরাই লাভ করে। 'কৃপা' কথার অর্থই তো করে পাওয়া। যুবকটি তার ভুল বুঝতে পেরে এবার থেকে গুরুদেবের অধীনে ধৈর্য, মনের একাগ্রতা ও অধ্যবসায় নিয়ে বেদ-শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল।

কঠোর সাধনার ফল একদিন পেল যুবকটি। সে হয়ে উঠল একদিন বেদ-জ্ঞানী পুরুষ, একজন মহাপণ্ডিত।

# আদর্শ ভ্রাতা

অযোধ্যার মহারাজ দশরথের তিন রাণী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম কৈকেয়ীর পুত্র ভরত, সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। চার ভাইয়ের মধ্যে খুব মিল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসেন। একের আনন্দে অন্যদের আনন্দ, একের দুঃখে অন্যদের দুঃখ।

দশরথ বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। রাজ্যশাসনের শক্তি তাঁর আর নেই। রামকে সিংহাসনে বসাবার মনস্থ করলেন তিনি। কিন্তু কৈকেয়ী বাদ সাধলেন। সেই সময় একদিন দশরথের কাছে দুটি বর প্রার্থনা করলেন। দশরথ অনেকদিন আগে কৈকেয়ীর দুটি প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুযোগ বুঝে কৈকেয়ী দশরথের কাছে দুটি বর প্রার্থনা করলেন। কৈকেয়ীর

প্রথম প্রার্থনা, 'রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস দেওয়া হোক। দ্বিতীয় প্রার্থনা, 'ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনের অধিকারী করা হোক।

দশরথ দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কি করবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। আবার কৈকেয়ীর প্রার্থনা নামাঞ্জুর করতেও পারেন না। বৃদ্ধ দুর্বল দশরথ দুঃখের আঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

রাম সমস্ত শুনলেন। পিতৃসত্য রক্ষা করবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বনে গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। সীতা স্বামীহারা হয়ে অযোধ্যায় বাস করতে পারবেন না। তিনি স্বামীর সঙ্গিনী হবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

লক্ষ্মণ চিরকালই রামের অনুরক্ত। তিনিও রাম-সীতার সঙ্গী হবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন। রাম লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। বললেন, 'তুমি বনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারবে না, তুমি রাজ্যে থেকে পিতা ও মাতাদের সেবাশুশ্রূষা করবে। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে প্রজাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।'

বাল্যকাল থেকেই রাম ও লক্ষ্মণ এক সঙ্গে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেছেন একই পরিবেশে, একসঙ্গেই মানুষ হয়েছেন। আজ রামের সঙ্গে লক্ষ্মণও যেতে চান বনে। বন জীবনের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার হতে চান তিনি। করুণকণ্ঠে রামচন্দ্রকে বললেন, তুমি ছাড়া এ রাজপুরী আমার কাছে অন্ধকারময়। তোমাদের জন্যই রাজপুরী আনন্দময়। তোমরা চলে গেলে আমার পক্ষে এখানে বাস করা সম্ভব নয়। আমাকে তোমাদের সঙ্গী করে নাও।

রাম অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তিনি লক্ষ্মণকে তাঁদের সঙ্গী হবার অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মণের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না। তিন

জনে বল্কল পরিধান করে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। দাস-দাসী, আত্মীয়-পরিজন, প্রজা-পিতামাতাকে কাঁদিয়ে তিনজনে অযোধ্যার রাজপুরী পরিত্যাগ করলেন। রাজা দশরথ এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

বনবাস-জীবনে লক্ষ্মণ রামের পাশাপশি থেকে রামকে সাহায্য করেছেন, রামের দুঃখ-কষ্ট, বিপদকে নিজের মনে করে কাজ করে গিয়েছেন। সীতাদেবীকে মায়ের মতো মনে করে সেবা করেছেন। লঙ্কার রাজা দুরাত্মা রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় অগ্রজ রামচন্দ্রকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করেছেন, প্রাণ বিপন্ন করে যুদ্ধ করেছেন, অগ্রজের নির্দেশ কায়মন বাক্যে প্রতিপালন করেছেন।

এতক্ষণ লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেমের কথা বললাম। এবার ভরতের কথায় আসি।

কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যখন চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে গেলেন এবং শোককাতর বৃদ্ধ দশরথ যখন প্রাণত্যাগ করলেন তখন ভরত মাতুলালয়ে। তাঁর সঙ্গে শত্রুঘ্নও ছিলেন। অযোধ্যাতে যে একটা বিপর্যয়ের ঘনঘটা শুরু হয়েছে ভরত তার বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না। দুঃস্বপ্ন আর দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে মাতুলালয়ে তাঁর দিন কাটছে। অয্যোধ্যার সংবাদের জন্য তিনি তখন ব্যাকুল।

ভরতকে আনবার জন্য অযোধ্যা থেকে একজন দূত গেল। অযোধ্যাতে ফিরে আসবার পর ভরত সমস্ত দেখে-শুনে দুঃখে-শোকে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়লেন। অযোধ্যাকে মনে হল শ্মশান। দশরথ মৃত। প্রাণপ্রতিম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অযোধ্যার কল্যাণী রাজবধূ ও প্রিয়তম লক্ষ্মণ সহ বনবাসিত। তাঁর মাতা কৈকেয়ী ছাড়া অযোধ্যার প্রতিটি মানুষ আজ বিষাদমগ্ন।

রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ভরতের কোমলপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল ; তিনি বললেন, পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার প্রাণের বন্ধু আমি যাঁর সেবক, সেই পুণ্যাত্মা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য আমার হৃদয় আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

ভরত সমস্ত দুর্গতির কারণ তাঁর মাতাকে ক্ষমা করতে পারলেন না। পিতার পারলৌকিক কর্মাদি শেষ হবার পর ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে রাজ্যের সচিবগণ ও বশিষ্ঠদেব অনুরোধ করলেন। কিন্তু সিংহাসনে বসতে কোনো প্রকারেই সম্মত হলেন না ভরত। তিনি বললেন জ্যেষ্ঠ রাজকুমারই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আমি রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে বসাব। অযোধ্যার প্রজাদের নিয়ে গিয়ে আমি রামচন্দ্রের চরণ ধরে কাতর প্রার্থনা জানাব, তিনি না এলে আমিও চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসী হব।

ভরত চললেন রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। তাঁর সঙ্গে চললেন রাণীগণ, শত্রুঘ্ন, সচিববৃন্দ এবং শত শত প্রজা।

এই কয়দিনেই ভরতের দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর মাথায় জটা, অঙ্গে বল্কল বসন।

ভরত চিত্রকূটের নিকটে গিয়ে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি দেখলেন, অযোধ্যার সর্বজনপ্রিয় সন্তান রামচন্দ্র তৃণের উপর আসীন, তাঁর দেহ ধূলিধূসর ও মলিন। ভরতের বুক যেন ফেটে গেল। তিনি সামান্য এক বালকের মতো কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারপর দুই ভাই আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। সে এক করুণ অথচ মধুর দৃশ্য! রামচন্দ্রের চরণ ধরে ভরত বহু মিনতি জানালেন, 'তোমার উপযুক্ত স্থান অযোধ্যার রাজসিংহাসন, তুমি ফিরে চলো! তুমি রাজগৃহে না ফিরলে আমিও তোমার সঙ্গে বনবাসী হব।'

ভরতকে বহু বোঝালেন রামচন্দ্র। তারপর নিজের পাদুকা ভরতকে দিয়ে তাঁকে রাজ্যে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। ভরত বললেন, 'এই পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করে আমি চৌদ্দ বৎসর তোমার নামে রাজ্যশাসন করব।'

পাদুকা মস্তকে ধারণ করে রাজধানীতে নয়—নন্দীগ্রামে ফিরে এলেন ভরত। সেই পাদুকার উপর রাজছত্র ধরে চৌদ্দ বৎসর তিনি সুশৃঙ্খলার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেছিলেন। ঋষির মতো জীবন যাপন করতেন তিনি। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলে ভরত সেই পাদুকা রামচন্দ্রের চরণে পরিয়ে প্রণাম করে বলেছিলেন 'তোমার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে আজ নিশ্চিন্ত হলাম।'

এরপর থেকে রামচন্দ্রের সেবাই হল ভরতের প্রধান ব্রত।

———

# দস্যুর নবজন্ম

ভারতবর্ষ মহামানব ও মুনি-ঋষিদের দেশ। সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে বহু মহামানব ও ঋষির জন্ম হয়েছে। তাঁরা নানাভাবে দেশ ও দশের মঙ্গল সাধন করেছেন।

বহু সহস্র বৎসর পূর্বে চ্যবন নামে এক মুনি ছিলেন। কিন্তু মুনির জীবনে একটি দুঃখ ছিল। তাঁর পুত্র ছিলেন দস্যু। তিনি পথিকদের উপর অত্যাচার করতেন। তাদের ধন-সম্পদ লুঠ করতেন। অনেককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। লোকজন ভয়ে সেই পথে চলতেন না।
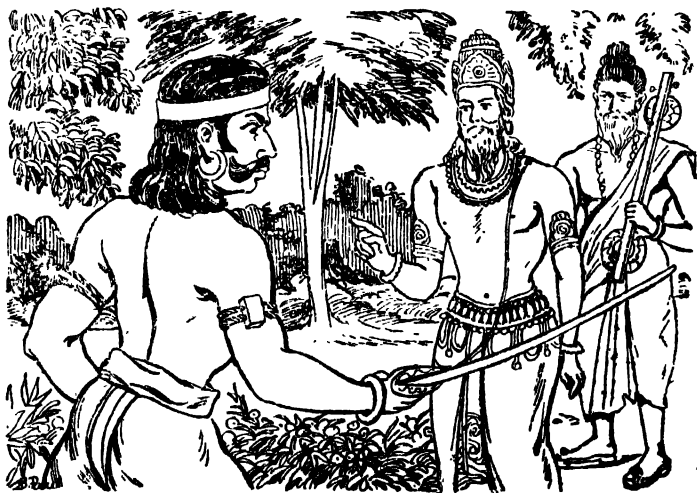
একদিন অরণ্যপথে চলেছেন ব্রহ্মা ও নারদ। মুনিপুত্র তাঁদের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রুক্ষস্বরে বললেন, তোমাদের কাছে

যা আছে, অবিলম্বে দিয়ে দাও। নইলে তোমাদের আমি হত্যা করব।'

ব্রহ্মা বললেন, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী। আমাদের কাছে তো কিছুই নেই।'

মুনি-পুত্র কঠিন আর গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমি কিছু শুনতে চাইনে, তোমাদের কাছে যা আছে, আমি তাই নিতে চাই।'

মুনি-পুত্রের অধঃপতন দেখে চিন্তিত হলেন ব্রহ্মা এবং নারদ। কিভাবে মুনি-পুত্রকে অসৎপথ থেকে সরিয়ে আনা যায়, সেই কথা চিন্তা করলেন ব্রহ্মা। তারপরে বললেন, 'তুমি তো প্রতিদিন পাপ-কর্ম করছ, কিন্তু তোমার এই পাপের ভাগী অন্য কেউ হবে কি?

মুনি-পুত্র হাসলেন। বললেন, 'নিশ্চয়ই, আমার পরিবারের প্রত্যেকেই আমার পাপের ভাগী হবে।'

ব্রহ্মা মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ, তবে তুমি তোমার পরিবারের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করো যে তারা তোমার পাপের ভাগ নিতে সম্মত কিনা। তুমি যাও। ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করব। তোমাকে কথা দিচ্ছি—আমরা পালাব না।'

মুনি-পুত্র কেমন কৌতুক বোধ করলেন। তিনি ব্রহ্মার কথায় সম্মত হয়ে গৃহে গেলেন। পরিবারের প্রত্যেককে—পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানকে জিজ্ঞাসা করলেন কেউ তাঁর পাপের অংশীদার হতে সম্মত কিনা। কিন্তু কেউই সম্মত হলেন না। মুনি-পুত্র নিরাশ ও দুঃখিত হলেন। তিনি বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে এলেন ব্রহ্মা ও নারদের কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন, এই পথ অর্থাৎ দস্যুতা জীবনের ধর্ম নয়, মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে পবিত্র জীবনযাপনের উপর। যে ঈশ্বর-বিমুখ, আপাতশান্তি সে পেলেও তার পরিণাম ভয়াবহ, মর্মান্তিক।

অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হতে লাগলো তাঁর মন। তিনি এখন যথার্থ শান্তি ও মঙ্গল চান, চান সত্য ও ঈশ্বরের পথে চলতে।

ব্রহ্মার চরণে লুটিয়ে পড়লেন মুনি-পুত্র। কেঁদে বললেন, 'আমি পাপ থেকে মুক্তি চাই, শান্তি-স্বস্তি ও মঙ্গল চাই।'

মুনি-পুত্র তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন দেখে আনন্দিত হলেন ব্রহ্মা। তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'তুমি এখন থেকে 'রামনাম' জপ করতে থাক। রামনাম জপই তোমার একমাত্র মুক্তি ও মঙ্গলের পথ।' এই বলে ব্রহ্মা নারদকে নিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

মুনি-পুত্র 'রাম' নাম জপ করার জন্য বার বার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু পাপমুখে ঐ পবিত্র নাম ধ্বনিত হ'ল না। বহু চেষ্টার পর তিনি 'মরা' 'মরা' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন। তিনি এক নির্জন স্থানে সাধনায় বসে 'মরা' ধ্বনি বার বার উচ্চারণ করতে থাকেন। এইভাবে 'মরা' 'মরা' বলবার পর একদিন তাঁর মুখ হতে 'রাম' নাম ধ্বনিত হল।

বহু বৎসর কঠোর সাধনার পর তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। বহু বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে তাঁর সর্বাঙ্গ বল্মীকের স্তূপে আবৃত হয়ে পড়ে। বল্মীকের স্তূপের মধ্য থেকে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালসার। এই সময় থেকেই মুনি-পুত্রের নাম হয় বাল্মীকি মুনি। দস্যু অবস্থায় তাঁর নাম ছিল রত্নাকর।

এই বাল্মীকি মুনিই পুণ্যগ্রন্থ 'রামায়ণ' মহাকাব্যের রচয়িতা। এই গ্রন্থ ভারতবাসীকে সত্যপথে চলবার প্রেরণা চিরকাল ধরে যুগিয়ে আসছে।

---

# কামধেনু

বহু বহু যুগ আগে প্রাচীন ভারতে এক বড় রাজা ছিলেন। নাম বিশ্বামিত্র। তাঁর বিরাট রাজ্য, বিপুল ঐশ্বর্য। তাঁর সৈন্যবলও বিপুল। তাঁর কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। অন্যান্য রাজারা বিশ্বামিত্রের পদানত।

একবার তিনি ভ্রমণে বের হলেন। সঙ্গে চলল তাঁর বিরাট সৈন্যদল। দেশ-দেশান্তর ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছালেন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে। বশিষ্ঠদেবের মহত্ত্ব ও সাধনার কথা তখন দেশ-

দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত। বহু রাজা মহারাজা, বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। এক নির্জন নির্মল পরিবেশে মনোরম এক আশ্রম করে বাস করেন তিনি।

বশিষ্ঠদেবের আশ্রমের মনোরম স্নিগ্ধ পরিবেশ বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ করল। সেখানে বিশ্রামের বাসনা জাগল তাঁর মনে।

বশিষ্ঠদেব রাজাকে বললেন, 'আপনি আমার সম্মানীয় অতিথি। আপনি আসন গ্রহণ করুন।'

বিশ্বামিত্র আসন গ্রহণ করলে বশিষ্ঠদেব আবার বললেন 'যদি অনুমতি দেন, তবে আপনাকে কিছু খাদ্য-পানীয় নিবেদন করি। আপনি ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। আমাকে অতিথি সেবার অধিকার দিন।'

বিশ্বামিত্র মৃদু হাসলেন। ভাবলেন, 'একজন মুনি এমন কি আহার তাঁদের জন্যে সংগ্রহ করবেন! কিন্তু রাজার ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত করে বশিষ্ঠদেব স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে নানান উপাদেয় খাবার এনে উপস্থিত করলেন। বিশ্বামিত্র বিস্মিত স্তম্ভিত। একজন মুনিঋষির পক্ষে এমন মূল্যবান খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করা কিভাবে সম্ভব, তা তিনি স্থির করতে পারলেন না। আহার পরম পরিতোষের সঙ্গে গ্রহণ করলেন তিনি। তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন— বশিষ্ঠদেব সবলা নামে এক গাভীর অধিকারী।

গাভীর কাছে যা প্রার্থনা করা যাবে, তাই পাওয়া যাবে। বিশ্বামিত্রের বিস্ময় আরো বৃদ্ধি পেল। বশিষ্ঠের এই কামধেনু পাবার জন্য তাঁর ভীষণ ইচ্ছা হল। তিনি বিনীতভাবে বশিষ্ঠদেবকে বললেন, 'আপনি সংসার-নিরাসক্ত ঋষি। এমন মহামূল্যবান গাভী নিয়ে আপনি কি করবেন? হে মুনিবর, আপনি গাভীটি আমায় দান করুন।

বশিষ্ঠদেব সম্মত হলেন না।

বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। সামান্য একজন মুনি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে সাহস পেল! তিনি তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'জোর করে গাভীটিকে নিয়ে যাও।'

সৈন্যরা গাভীটিকে নিয়ে যেতে এলে ভয়ে চীৎকার করে উঠল গাভীটি। তার মুখ থেকে তখন বেরিয়ে এল অসংখ্য

সশস্ত্র সৈন্য। এইসব সৈন্যের হাতে বিশ্বামিত্রের সৈন্যদল পরাজিত ও নিহত হল।

প্রবল প্রতাপশালী রাজা বিশ্বামিত্র পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এই অপমানের আর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হবে। তিনি বুঝলেন, দৈবশক্তির অধিকারী হতে না পারলে বশিষ্ঠদেবকে জব্দ করা যাবে না।

রাজ্যভার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করে সাধনায় মগ্ন হলেন রাজা বিশ্বামিত্র। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে একটি বর দিলেন। বিশ্বামিত্র এই বরে ইচ্ছামত যে কোনো ধরণের মারণাস্ত্র পাবার অধিকারী হলেন।

বশিষ্ঠদেবের আশ্রম ধ্বংস করবার জন্য বিশ্বামিত্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কিন্তু ঋষি বশিষ্ঠ বিপুল শক্তির অধিকারী। তিনি ব্রহ্মদণ্ড হাতে নিয়ে বিশ্বামিত্রের উপর আক্রমণ চালালেন। বিশ্বামিত্র শিবের বর পাওয়া সত্বেও বশিষ্ঠদেবের এতটুকুও ক্ষতিসাধন করতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন, বশিষ্ঠদেব বিরাট ক্ষমতার অধিকারী। সেই মহান ঋষির ক্ষতিসাধন করা তাঁর সাধ্যাতীত।

ব্রাহ্মণ হবার বাসনা জাগল রাজা বিশ্বামিত্রের মনে। তিনি এবার মগ্ন হলেন গভীর সাধনায়। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ তাঁর মন থেকে দূর হয়ে গেল। শক্তি এবং ঐশ্বর্যের মোহ থেকে মুক্ত হলেন তিনি। তাঁর কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট হলেন ভগবান। বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব দান করলেন তিনি। ব্রাহ্মণ হবার পরে তাঁর মনে বশিষ্ঠদেবের ক্ষতিসাধনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আর রইল না।

রাজা বিশ্বামিত্র জগতে পরিচিত হলেন ঋষি বিশ্বামিত্র নামে।

———

# মহাপ্রস্থানের পথে

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের পরাজিত করে পাণ্ডুর পাঁচজন সন্তান যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সগৌরবে রাজ্য পরিচালনা করেন। এই পঞ্চপাণ্ডবের মনে একদিন জেগে উঠল গভীর বৈরাগ্য।

জীবনের সমস্ত কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ করে যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসালেন। তারপর চার ভাই আর দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন স্বর্গের পথে। দুঃখ-কষ্ট ও মায়ার সংসার ত্যাগ করে জীবনের চরম লক্ষ্য স্বর্গে উপস্থিত হবার জন্য যাত্রা শুরু করলেন। পিছনে পড়ে রইল প্রিয় মাতৃভূমি ভারত, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব। সমতল প্রান্তর পেরিয়ে হিমালয়ের বন্ধুর পথে এসে পড়লেন তাঁরা।

হিমালয়ের সর্বশেষ চূড়ার শেষেই স্বর্গ প্রবেশের দ্বার। ক্লান্তিহীন হয়ে আনন্দে এগিয়ে চলেন তাঁরা—হিমালয়ের এক শৃঙ্গ থেকে অন্য উচ্চতর শৃঙ্গে। তাঁরা লক্ষ্য করলেন একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গ নিয়েছে। দিনের পর দিন তাঁদের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে কুকুরটি।

স্বর্গের যত নিকটে তাঁরা এগোন ততই সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখেন পথের দুইপাশে। চন্দ্র-সূর্যের অপরূপ আলো, সুমধুর বাতাস, মধুর একটা সুর তাঁদের মন-প্রাণকে মুগ্ধ করতে থাকে।

কিন্তু স্বর্গে সশরীরে পৌছানো মহাভাগ্যের কথা।

সবার পিছনে ছিলেন দ্রৌপদী। এক পর্বত শৃঙ্গের পথে তিনি সহসা পড়ে গেলেন।

এ পথে দাঁড়াবার উপায় নেই। পিছনে ফেরার সময় নেই।

সম্মুখে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য। দ্রৌপদী পড়ে রইলেন পিছনে। সম্মুখে এগিয়ে চলেন পঞ্চপাণ্ডব।

কৌতূহলী হয়ে ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ধর্মাত্মা,' নারীকুলমণি দ্রৌপদী পথের মাঝে পড়ে গেলেন কেন ?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'দ্রৌপদী নারীদের মধ্যে গুণবতী হলেও তাঁর একটি দোষ ছিল। তিনি পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনকেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। যে নিষ্পাপ, সেই শুধু এই দুরূহ পথের শেষে পৌঁছাবে।' দ্রৌপদীর পর এল সহদেবের পালা। তিনি ও পরদিন অবশ হয়ে পড়ে গেলেন।

ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ধর্মাত্মা, সহদেবের পড়ে যাবার কারণ কি ?'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'সহদেবের মনে অহংকার ছিল—সে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান।'

নকুলও একদিন পথের মাঝে পড়ে গেলেন।

ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ধর্মাত্মা, নকুলের কি অপরাধ ?'

পূর্বের মতোই শান্তকণ্ঠে যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'নিজেকে সবার চেয়ে সুন্দর বলে নকুল গর্ব অনুভব করত! এই গর্বই তার পতনের কারণ।

এগিয়ে চললেন যুধিষ্ঠির। সঙ্গে দুই ভাই—ভীম, অর্জুন ও একটি কুকুর।

হঠাৎ অর্জুন পড়ে গেলেন। ভীমের অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি জানেন—অর্জুন জনপ্রিয়, বীরশ্রেষ্ঠ।

ভীম জিজ্ঞাসা করলেন, 'অর্জুনের মতো বরণীয় পুরুষের পতনের কারণ কি, ধর্মাত্মা ?'

স্থির সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির—'অর্জুন সত্যিই অপরূপ মানুষ। কিন্তু তাঁর মনেও শক্তির গর্ব ছিল। তিনি গর্বভরে বলেছিলেন যে একদিনেই তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করবেন। বিধাতা তাই তাঁকে ক্ষমা করলেন না।'

দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন যুধিষ্ঠির ও ভীম। সঙ্গে সেই বিচিত্র কুকুর।

অবশেষে ভীম ক্লান্ত ও অবশ হয়ে পড়লেন। পড়ে গেলেন তিনি। ভীম কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ধর্মাত্মা, হে মহাপ্রস্থানের পথের একক যাত্রী, আমার অপরাধের কথা বলে যাও।'

স্থিতপ্রজ্ঞ যুধিষ্ঠির শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে হতে বললেন—'তুমি নিজেকে বলবান পুরুষ বলে ভাবতে। তোমার এই অহংকারই তোমার পতনকে ডেকে এনেছে।'

দৃঢ় নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে, বিপুল উত্তম নিয়ে ক্লান্তিহীন এক পুরুষ সম্মুখের দিকে এগিয়ে চললেন। ধীরে ধীরে পথের শেষ হয়ে আসে। সামনে দেখা যায় সূর্যালোকে উজ্জ্বল স্বর্গ-প্রবেশের দ্বার। সেই অমর স্বর্গ-প্রবেশের দ্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। তাঁর সঙ্গে এখনো সেই কুকুর। সেই অমৃতলোকের দ্বারে করাঘাত করলেন ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—'দ্বার খোলো।'

খুলে গেল দ্বার। সোনার রথে সহাস্যে এগিয়ে এলেন স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র। স্বাগত জানালেন মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে। ইন্দ্র বললেন—'এসো, হে পুণ্যাত্মা মানব, এসো এই স্বর্গপুরীতে—এই অমৃতলোকে। মৃত্যুকে জয় করেছ তুমি। এসো, হে একক মানব।

কুকুরটিকে নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন যুধিষ্ঠির।

ইন্দ্র বললেন, 'সামান্য কুকুরকে নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না আপনাকে। আপনি একা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করুন।'

মহাপ্রাণ যুধিষ্ঠির দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'এতদূর পথ যে আমাকে ভালবেসে এসেছে, তাকে ফেলে রেখে স্বর্গে প্রবেশ করতে চাই না, দেবরাজ।'

দেবরাজ ইন্দ্র মুগ্ধ হলেন যুধিষ্ঠিরের কথায়। মস্তকে সেই সময় পুষ্পবৃষ্টি হল। সুমধুর বাজনা আর গানে চারদিক মুখরিত হল। আর একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটল। কুকুরের দেহ দেব-দেহে পরিণত হল। আবির্ভূত হলেন ধর্ম। ধর্মই এতকাল কুকুরের বেশে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ নিয়েছিলেন। ধর্ম পরম স্নেহে আলিঙ্গন করলেন যুধিষ্ঠিরকে। বললেন, 'হে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ মানব, তুমি ধন্য। তোমার আগমনে স্বর্গও ধন্য হল।'

একজন মানব পূর্ণ গৌরব নিয়ে, পবিত্র অন্তর নিয়ে সশরীরে অমৃতময় স্বর্গলোকে প্রবেশ করলেন।

---

# নির্লোভ পণ্ডিত-দম্পতি

কৃষ্ণনগরের রাজা শিবচন্দ্রের রানী গঙ্গায় স্নান করছেন। এই সময় আর একজন ব্রাহ্মণীও স্নান করতে নামলেন ঘাটে। এক সময় ব্রাহ্মণীর হাতের জল রানীর গায়ে ছিটকে পড়ল। রানীর পরিচারিকারা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হল। ব্রাহ্মণীর দিকে তাকিয়ে তারা বুঝল—ব্রাহ্মণী দরিদ্রা। এমন কি এক জোড়া শাঁখা কিনবার সামর্থ্যও
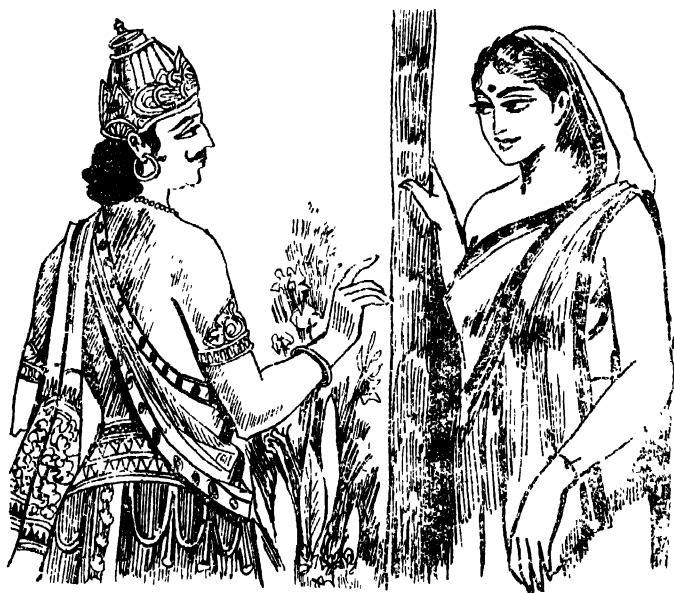
নেই ব্রাহ্মণীর। আয়োতির চিহ্ন স্বরূপ হাতে তাঁর লাল সূতো বাঁধা। পরিচারিকাদের একজন বলে উঠল, "হাতে যার একজোড়া শাঁখাও জোটে না, তার আবার এতো তেজ কেন?"

সহজ শান্ত স্বরে ব্রাহ্মণী বললেন, "এই সূতো যতদিন আছে, নবদ্বীপের মানও ততদিন। সেই জন্যেই তো আমার তেজ!

রাজার কানে সমস্ত খবর গেল। তিনি বুঝলেন—ব্রাহ্মণী নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত রামনাথের গৃহিনী ছাড়া অন্য কেউ নন।

রাজা কৌতূহলী হলেন। রামনাথের সাথে দেখা করবার জন্যে তিনি যাত্রা করলেন।

ন্যায়শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত রামনাথ গ্রামের প্রান্তে এক জীর্ণ কুটীরে বাস করতেন। প্রাঙ্গণে ছিল একটি তেঁতুল গাছ। সেই গাছটি ছিল তাঁর প্রধান সম্পত্তি। তাঁর বিশ্রামের স্থান ছিল এই তেঁতুল গাছের তলা। কিছুদূরে একটি বনের মধ্যে তাঁর টোল ছিল বলে 'বুনো রামনাথ' নামে সবার কাছে পরিচিত হন।

রামনাথ যখন ছাত্রদের শিক্ষাদানকার্যে ব্যস্ত, তখন রাজা এসে উপস্থিত হলেন। রামনাথ সমাদরে রাজাকে তালের চাটাই এ বসতে বললেন। রাজা মহাপণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতী শব্দ ব্যবহার করে বললেন, "আপনার কোনরূপ অনুপপত্তি আছে কি?" অনুপপত্তির অর্থ—অভাব।

রামনাথ অনুপপত্তির শাস্ত্রীয় অর্থ বুঝলেন—অনুপপত্তির শাস্ত্রীয় অর্থ—"বুঝতে না পারা"। রামনাথ মৃদু হেসে বললেন, "শাস্ত্রের কোনো অংশ আমার কাছে অস্পষ্ট নেই। সকল সমস্যার উপপত্তি আমি করেছি।"

রাজা বললেন, "শাস্ত্রের অভাবের কথা আমি বলি নি। আপনার সাংসারিক অভাব-অনটনের কথাই জিজ্ঞেস করছি।"

রামনাথ সংসারের অভাব অভিযোগের খোঁজ-খবর বিশেষ রাখেন না। কি ভাবে খাবার জোটে—তা জানতেন না তিনি।

রাজা শিবচন্দ্র পণ্ডিত গৃহিণীর কাছে গেলেন। শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের সংসারে কোনোরূপ অভাব আছে কি মা?"

ব্রাহ্মণী বললেন, "আমাদের তো কোনো অভাব নেই, বাবা। একটা ঘর আছে আমাদের। মাদুর, জলের কলসী, মাটির প্রদীপ আর পিতলের ঘটী আমাদের আছে। কলাগাছের পাতায় আমরা খাই।" একটুখানি চুপ করে থেকে তেঁতুল গাছটির দিকে চেয়ে হাসিভরা মুখে বললেন, 'তেঁতুল গাছের ফল আর পাতা দিয়ে ব্যঞ্জনের কাজ হয়। ছেলেরা চাল-ডাল ভিক্ষে করে নিয়ে আসে। সংসারে তো কোনরূপ অভাব-অনটন নেই, বাবা।"

রাজা বিস্মিত, মুগ্ধ। চরম দুঃখের রাজ্যে বসে পরম আনন্দের বাণী তিনি যেন শুনছেন। পণ্ডিত-দম্পতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় বিগলিত হলেন তিনি।

ফিরে এসে তিনি কর্মচারীদের দিয়ে রামনাথের কাছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু ও খাদ্যদ্রব্য পাঠালেন। এরপর থেকে প্রতি মাসেই রামনাথের গৃহে রাজা ভালোরকম সিধা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

———

# যমালয়ে ঋষি বালক

উদ্দালক মুনি এক বিরাট বিশ্বজিৎ যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, মুনিঋষিরা আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন। একদিকে হোমাদি ক্রিয়া চলছে, অন্যদিকে চলছে দান ও ভোজন ক্রিয়া। উদ্দালক মুনি ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলকে গোদান করছেন।

উদ্দালক মুনির পুত্র নচিকেতা যজ্ঞের অনুষ্ঠান আনন্দে দেখে বেড়াচ্ছে। ভক্তি ও বিশ্বাসে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দানাদি ক্রিয়া যেখানে হচ্ছে সেখানে গিয়ে নচিকেতার মন ব্যথায় ভরে গেল। সে দেখল, তার পিতা যে সব গরু দান করছেন, সেগুলি অক্ষম, রুগ্ন—

সেগুলির দ্বারা বিশেষ কাজ পাওয়া যাবে না। নচিকেতা ভাবল, এমন সুন্দর যজ্ঞ নিষ্ফল হতে চলেছে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যজ্ঞকে নিষ্ফল হতে দেব না কিছুতেই।

পিতার কাছে গিয়ে নচিকেতা বলল, 'বাবা, আপনি তো সব কিছু দান করতে চলেছেন, তবে আমাকে কার কাছে দেবেন?'

মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না, নচিকেতা, তুমি এখন যাও।

নচিকেতা যজ্ঞকে নিষ্ফল হতে দেবে না। সে আবার বলল—বাবা, আমিও তো আপনার সম্পত্তি। এত গরু, সম্পদ তো দান করছেন, আমাকে দান করবেন না?

বিরক্তি আর ক্রোধ ভরে পুত্রকে তিরস্কার করলেন উদ্দালক মুনি।

কিন্তু নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যজ্ঞকে নিষ্ফল হতে দেবে না কিছুতেই। কিছুক্ষণ পরে আবার বলল—'আমাকে কারো কাছে দিন বাবা।'

এবার অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়লেন মুনি। পুত্রকে বললেন, 'যাও, যমের কাছে যাও। দেখতে পাচ্ছনা আমি ব্যস্ত আছি।

পিতার কথায় নচিকেতা অন্তরে ভীষণ আঘাত পেল। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, 'বাবা আমাকে মরতে কেন বললেন? আমি তো কোনো দোষ করি নি! তাঁর পুত্র হিসাবে, শিষ্য হিসাবে আমি কোনোদিন নিকৃষ্ট ছিলাম না। তবে? বাবা আমাকে যাই বলুন, যে ভাবেই বলুন, আমাকে তাঁর আদেশ পালন করতেই হবে। নইলে যজ্ঞ সার্থক হবে না। মনকে শান্ত ও প্রফুল্ল করে সে পিতার কাছে বিদায় প্রার্থনা করল।

বিস্মিত মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় যাবে, নচিকেতা?

নচিকেতা বলল, আপনার নির্দেশে আমি মৃত্যুর কাছে যাব বাবা।

আশঙ্কায় শিহরিত হল মুনির বুক। স্নেহভরে ওর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তুমি বিরক্ত করছিলে বলে রাগের বশে ও কথা বলেছি, তোমাকে সত্যি যেতে বলি নি। তোমাকে যমের কাছে যেতে হবে না নচিকেতা।'

নচিকেতা চিরদিনই দৃঢ়চিত্ত। সে বলল, 'আপনি যে ভাবেই বলুন, আপনার কথা মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। আমাদের পূর্বপুরুষ চিরদিন সত্যরক্ষা করে গেছেন, আপনার কথাকে সত্যে পরিণত করা আমার ধর্ম।'

নচিকেতার জেদ দেখে পিতা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বুঝলেন যে নচিকেতাকে ফেরানো যাবে না।

পিতাকে সান্ত্বনা দিল নচিকেতা। বলল, 'দুঃখ করবেন না বাবা। আমি গর্ববোধ করছি এই ভেবে যে পিতার সত্য আমি রক্ষা করতে সক্ষম। আপনি কিছু ভাববেন না। নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল হবে।'

যজ্ঞক্ষেত্রে নেমে এল ঘোর দুঃখের ছায়া। বালক নচিকেতা যাত্রা করেছে যমগৃহে। সবাই শোকে কাতর। উৎসবের আনন্দ নষ্ট হতে চলল।

নচিকেতা যমের গৃহে এসে উপস্থিত হল। যম গৃহে না থাকায় সে দ্বারে অবস্থান করতে লাগল। যমের অনুচরবৃন্দ এল অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু নচিকেতা ভিতরে গেলেন না। তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় যমের দ্বারে অবস্থানের পর যম এলেন। ব্রাহ্মণ অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ দিয়ে অভ্যর্থনা করতে গেলেন। বললেন, 'হে অতিথি

আপনি তিন দিন অনাহারে এভাবে পড়ে আছেন। আমার অপরাধ হয়েছে। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আর আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য আপনাকে আমি তিনটি বর দিচ্ছি। আপনি বর প্রার্থনা করুন।

যমের ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত হল নচিকেতা। সে বলল, 'হে যমরাজ, আমার পিতা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন এবং দুঃখিত অন্তরে আমাকে বিদায় দিয়েছেন। আপনি এই বর দিন যেন আমার পিতার রাগ কমে যায় এবং তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন। যখন আপনি আমার পিতার কাছে পাঠাবেন তখন তিনি যেন আমাকে আনন্দিত মনে গ্রহণ করেন।'

যমরাজ সেই বর দিলেন। প্রথম বরে নচিকেতা পিতার শোক দূর করা এবং মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে যাওয়ার বর প্রার্থনা করলেন।

নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করলেন, 'হে যমরাজ, আনন্দময় স্বর্গলোক লাভ করতে হলে অগ্নিতত্ত্ব জানা প্রয়োজন। আপনি সেই তত্ত্ব জানেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে এই অগ্নিতত্ত্ব শিক্ষা দিন।'

অত্যন্ত জটিল অগ্নিতত্ত্ব নচিকেতা অতি সহজেই যমের কাছ থেকে শিক্ষা করলেন। নচিকেতার জানবার আগ্রহ, অসাধারণ বুদ্ধি ও গ্রহণক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলেন যম। সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোমার মতো শিষ্য কদাচিৎ দেখা যায়। আমি আনন্দিত হয়ে তোমাকে আর একটি বর দিচ্ছি। এই বরে তোমাকে যে অগ্নিতত্ত্ব শেখালাম তার নাম হবে নচিকেতা-অগ্নি। এই অগ্নির অর্চনা করে সবাই স্বর্গলাভ করতে পারবে। এটি হল চতুর্থ বর।'

নচিকেতা এবার চতুর্থ বর প্রার্থনা করল, 'হে যমরাজ, আত্মা সম্পর্কে নানাজনের নানা মত। কেউ বলেন আত্মা আছে, কেউ বলেন, নেই। আমাকে এই আত্মা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দান করুন, মৃত্যুরাজ!

গম্ভীর হলেন যম। ধীরস্বরে বললেন, 'এ তত্ত্ব দেবতাদের কাছেও দুর্জ্ঞেয়। তুমি অন্য বর প্রার্থনা করো, নচিকেতা।'

কিন্তু নচিকেতা চিরদিনই দৃঢ়চিত্ত। তাকে সৎ-ইচ্ছা থেকে কেউ কোনোদিন নিবৃত্ত করতে পারে নি। সে বললে, 'আপনি ছাড়া অন্য কেউ এই তত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারেন না। আমাকে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান দিন। অন্য বর আমি চাই নে।'

যম নানা প্রকার প্রলোভন দেখিয়ে নচিকেতাকে দমন করতে চাইলেন। তিনি নানাভাবে তাকে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করলেন—যাতে তিনি বুঝতে পারেন আত্মতত্ত্ব জানবার যথার্থ অধিকার নচিকেতার আছে। তিনি নচিকেতাকে প্রচুর ধন-সম্পদ, সসাগরা পৃথিবী, দীর্ঘজীবন, দুর্লভ বস্তু—দেবতা ও মানুষের সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু দান করতে চাইলেন। কিন্তু নচিকেতা অচল অটল, কোন প্রকারেই সংকল্পচ্যুত হল না।

যম এবার অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বুঝলেন, নচিকেতা ধৈর্যশীল, ধীর ও দৃঢ়চিত্ত, যথার্থ বুদ্ধিমান, প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী, সকল কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বচারী ; বললেন, 'তোমার মতো শিষ্য দুর্লভ। আমি তোমাকে এই বিদ্যা দান করব।'

যম নচিকেতাকে আত্মার বিষয়ে শিক্ষাদান করলেন। আত্মা যে অজয়, অমর, অসীম, অনন্ত—এই চরম জ্ঞান লাভ করল নচিকেতা। এইভাবে সে মৃত্যুকে জয় করল অর্থাৎ মৃত্যুর পর সে আত্মাকেই লাভ করবে।

যমরাজের কাছ থেকে নানা জ্ঞানলাভ করে নচিকেতা পিতৃগৃহে ফিরে এল। আনন্দে ভরে উঠল উদ্দালক মুনির গৃহ।

# মহান আত্মদান

কঠোর তপস্যায় বসেছেন ইন্দ্র। উদ্দেশ্য বৃত্রাসুরকে পরাজিত ও নিহত করা। আশুতোষ মহাদেবের বরলাভ করে অসুরাধিপতি বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গের অধিপতি হয়ে বসেছেন। দেবগণের অবস্থা রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো!

ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবীও বন্দিনী হয়ে বৃত্রাসুরের পত্নী ঐন্দ্রিলার পদসেবায় নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর দুর্গতি ও লাঞ্ছনার অবধি নেই।

ইন্দ্র সুমেরু পর্বতে নিয়তির আরাধনায় মগ্ন। তাঁর কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে নিয়তি আবির্ভূত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন, 'অধর্মাচারী দুরাত্মা বৃত্রাসুরের পতনের উপায় জানেন মহাদেব।'

ইন্দ্র অবিলম্বে কৈলাসে মহাদেবের নিকট উপস্থিত হলেন। শিব সমস্ত অবগত হয়ে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। শঙ্করী মহাদেবকে শান্ত করলেন। মহাদেব ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন, 'বদরিকাশ্রমে দধীচি নামে এক মহামুনি তপস্যায় রত। তিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলে, তাঁর অস্থির সাহায্যে এক মারাত্মক অস্ত্র তৈরী করতে হবে। সেই অস্ত্রই হবে বজ্রাস্ত্র। এই বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম বিশ্বকর্মা। সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করলেই দেবশত্রু দুরাত্মা বৃত্রাসুর নিহত হবে।'

ইন্দ্র এলেন বদরিকাশ্রমে দধীচি যেখানে সাধনায় মগ্ন। মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচির সামনে নত হয়ে বৃত্রাসুরের ব্যাপার নিবেদন করলেন। বিনীতকণ্ঠে বললেন, 'হে মুনিশ্রেষ্ঠ, স্বর্গরাজ্য আজ বিপন্ন। আমরা আজ শক্তিহীন। একমাত্র আপনিই আজ দেবতাদের সম্মান রক্ষা করতে পারেন।' মহামুনি দধীচির মস্তক স্পর্শ করে ইন্দ্র আবার বললেন, 'আপনি অনুক্ষণ কল্যাণ-চিন্তায় রত। পার্থিব জীবনে মানুষের পরম কর্তব্য যে পরহিত সাধন, এ সত্য আপনি জানেন। আপনি দেবতাদের কল্যাণে মহান আত্মদান করলে আপনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এবং আপনার বংশে মহর্ষি দ্বৈপায়ণ জন্মগ্রহণ করে বদরিকাশ্রমকে পুণ্যতীর্থ করে তুলবেন।

দধীচি সাধনার দ্বারা সব কিছু অবগত হয়েছিলেন। তিনি প্রশান্ত হেসে বললেন, 'আমি একজন সামান্য মানব মাত্র। আমার অস্থি দ্বারা নির্মিত অস্ত্রে আপনাদের মহাকল্যাণ সাধিত হবে। প্রাণ দান করা আমি পরম গৌরবের ব্যাপার বলে আজ মনে করছি।' এই বলে মুনিশ্রেষ্ঠ ধ্যানমগ্ন হলেন। এক অনুপম জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল তাঁর মুখমণ্ডল।

দধীচির শিষ্যগণ উদাত্ত কণ্ঠে বেদগান শুরু করলেন। ভগবানের

নাম-গানে মেতে উঠল সবাই। ধীরে ধীরে দধীচির দেহের স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেল। মুনিবরের প্রাণবায়ু বের হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আকাশ থেকে মুনিবরের প্রাণশূন্য দেহের উপর পুষ্পবৃষ্টি হল। বেজে উঠল শঙ্খধ্বনি।

দেবগণের কল্যাণের জন্য মহামুনি দধীচি আত্মদান করলেন।

দধীচির অস্থি দ্বারা নির্মিত হল নিদারুণ বজ্রাস্ত্র।

শুরু হল দেবতাদের সঙ্গে অসুরের ভীষণ সংগ্রাম। বৃত্র শিবপ্রদত্ত ত্রিশূল নিক্ষেপ করলেন। মহাদেব ত্রিশূলটি নিজ হস্তে তুলে নিলেন। ইন্দ্র রক্ষা পেলেন। এবার বৃত্রাসুরের বক্ষে নিক্ষেপ করা হল বজ্রাস্ত্র। বৃত্র নিহত হলেন। ইন্দ্র তাঁর সমস্ত কিছু ফিরে পেলেন।

দধীচির মহান আত্মত্যাগ দেবতাদের স্বর্গরাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করল।

---

# দেবী দুর্গার ছলনা

সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে লঙ্কার রাক্ষসরাজা দুরাত্মা রাবণ। রামচন্দ্র বানরসৈন্য নিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করে বীরবিক্রমে আক্রমণ করলেন লঙ্কা। তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। উভয় পক্ষেই বড় বড় বীর, যোদ্ধা। যুদ্ধে কেউ কম যান না। রাবণ পক্ষের কয়েকজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রামচন্দ্র ও তাঁর দলবলের হাতে নিহত হলেন। কিন্তু রাবণের পতন ঘটানো কিছুতেই সম্ভব হল না।

রামচন্দ্র বুঝলেন, দেবী দুর্গার কৃপা ব্যতীত অমিত শক্তিধর রাবণের পতন ঘটানো সম্ভব নয়।

দেবী দুর্গার আরাধনা করতে মনস্থ করলেন তিনি। অকালে দুর্গাপূজার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেললেন। পূজার জন্য প্রয়োজন এক:শো আটটা নীলপদ্ম। রামের প্রিয় ভক্ত হনুমান বহু চেষ্টার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক নীলপদ্ম সংগ্রহ করলেন।

পরম;ভক্তিভরে রামচন্দ্র অকালে শুরু করলেন দুর্গাপূজা।

রামচন্দ্র যথার্থ তাঁর ভক্ত কিনা তা পরীক্ষার জন্য দেবী দুর্গা

ছলনার আশ্রয় নিলেন। রামচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে তিনি একটি নীলপদ্ম সংগোপনে সরিয়ে ফেললেন। পূজা করতে করতে রামচন্দ্র একসময় সভয়ে লক্ষ্য করলেন, একটি পদ্মফুল নেই। সেই মুহূর্তে তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁর দেবীপূজা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? দেবী কি রাবণের পতন চান না? দুশ্চিন্তার মেঘে রামচন্দ্রের সুন্দর মুখখানি কালো হয়ে গেল! তিনি জানেন, বহু চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলে একশো আটটা নীলপদ্ম সংগৃহীত হয়েছে। শত অনুসন্ধান করলেও নীল পদ্ম আর পাওয়া যাবে না।

অশ্রুতে পরিপূর্ণ হল রামচন্দ্রের দুটি নয়ন। তিনি কাতর প্রার্থনা জানালেন দেবী দুর্গার কাছে—'পথ বলে দাও মাতা।' কিন্তু কোনো উপায়ই খুজে পেলেন না তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হল, আমার নয়ন তো নীলপদ্মের মতো দেখতে। আর বিলম্ব ও দ্বিধা করলেন না তিনি। মনকে মুহূর্তে প্রস্তুত করলেন। তুলে নিলেন তীর ও ধনু। তীরের সাহায্যে একটি চক্ষু উৎপাটন করতে গেলেন।

দেবী আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তি ও আন্তরিকতার এমন মহান প্রকাশ দেখে তিনি স্বমূর্তিতে আর্বিভূত হলেন রামচন্দ্রের সম্মুখে। বললেন, 'তোমার কার্য থেকে নিবৃত্ত হও রাম। আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি আশীর্বাদ করছি—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।' এই বলে দেবী নীলপদ্মটি রামচন্দ্রের সম্মুখে রাখলেন! তারপরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রামচন্দ্র অকালে দেবীর বোধন করেছিলেন বলে আমাদের দেশে অকালে পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে। শারদীয় দুর্গাপূজাই আজ বাঙালীর প্রধান সামাজিক উৎসব।

---

# উরুভংগ

কৌরবগণ পাণ্ডবদের হাতে বার বার পরাজিত হতে লাগলেন। কৌরবপক্ষের বড় বড় বীর পাণ্ডবদের হাতে নিহত হলেন। দুর্যোধনের একশো ভায়ের মধ্যে নব্বই জনকে ভীম বধ করলেন। বাকি রইলেন দুর্যোধন। দুর্যোধনের যুদ্ধজয়ের সকল আশা নিভে গেল। তিনি বুঝলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোনো অর্থ নেই, যে কোনো মুহূর্তেই তিনি পাণ্ডবের হাতে ধরা পড়তে পারেন। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে লোভী মহাদাম্ভিক দুরাত্মা দুর্যোধন কুরুক্ষেত্র থেকে পালালেন রাত্রির অন্ধকারে।

কুরুক্ষেত্রের কিছুদূরে দ্বৈপায়ণ নামে যে একটা হ্রদ ছিল সেই হ্রদের জলের ভিতরে লুকিয়ে রইলেন তিনি। দিনের আলোয় হ্রদের বাইরে আসতে সাহস পেলেন না।

কোরব পক্ষের এগারো অক্ষৌহিনী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। পাণ্ডব সৈন্যরা বিজয় ধ্বনিতে মুখরিত করল আকাশ-বাতাস। কৌরব পক্ষেরই যে শুধু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা নয়, পাণ্ডবদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট। তাদের কয়েকজন বড় বড় মহারথী ছাড়া সাধারণ সৈন্যের বেশীর ভাগই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন।

বিজয়ী পাণ্ডবপক্ষের এবার কাজ হল সমস্ত অশান্তির মূল দুরাত্মা দুর্যোধনকে খুঁজে বের করা। দুর্যোধনের অন্বেষণে চারিদিকে বেরিয়ে পড়ল পাণ্ডবদের লোকজন।

যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্যোধনকে দেখতে না পেয়ে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাকে খুঁজতে বের হলেন। এই তিনজন কৌরব বীর দ্বৈপায়ণ হ্রদের তীরে এসে দুর্যোধনকে ডাকতে লাগলেন। পরিচিত মানুষের

কণ্ঠস্বর শুনে দুর্যোধন জলের উপরে মুখ তুললেন। অশ্বত্থামা দম্ভ নিয়ে বললেন, 'আমি পাণ্ডবদের পরাজিত করব—এই প্রতিজ্ঞা করছি। মহারাজ, আপনি নির্ভয়ে উঠে আসুন।'

অশ্বত্থামার কথায় দুর্যোধন বিন্দুমাত্র আশান্বিত হলেন না। কারণ তাঁর শরীর দুর্বল ও ক্ষতবিক্ষত, সৈন্যবলও নেই। তিনি বললেন, 'এই হ্রদের জলে আমি অন্তত একদিন বিশ্রাম করতে চাই।'

এমন সময় একদল ব্যাধ অদূরে গাছের আড়াল থেকে বুঝতে পারে যে দুর্যোধন পাণ্ডবদের ভয়ে হ্রদের জলে লুকিয়ে আছেন। তারা পুরস্কারের জন্য পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে সব জানাল। পাণ্ডবরা তখন জয়বাদ্য ও জয়ধ্বনি করতে করতে হ্রদের দিকে এগোলেন। অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ভয়ে পালালেন। দুর্যোধন আবার জলের তলায় লুকিয়ে পড়লেন।

জলের ভেতর থেকে দুর্যোধনকে কিভাবে উপরে তোলা যায়, তা ঠিক করতে লাগলেন পাণ্ডবগণ। তখন সাধুব্যক্তিদের পরিত্রাণকর্তা ও দুষ্কৃতকারীদের নিধনকর্তা মহামানব শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে নির্দেশ দিলেন, 'তারস্বরে দুর্যোধনকে গালাগালি দাও। দুর্যোধম নিজের মান-অপমান সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। সে গালাগালির উত্তর দেবার জন্য নিশ্চয়ই জলের বাইরে আসবে।'

ভীম দুর্যোধনকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। মনের সুখে তিনি কটু ভাষায় দুর্যোধনকে গালাগালি দিতে লাগলেম। ভীম তীব্রভাবে গালাগাল দিয়ে চললেম আর দ্বৈপায়ণ হ্রদের স্থির জলের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় মা। অবশেষে ভীম ব্যঙ্গ করে বললেন, 'মহামান্য বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজা যিনি, তাঁর কি শোভা পায় কাপুরুষের মতো জলের তলায় লুকিয়ে থাকা? সবাইকে মৃত্যুমুখে

পাঠিয়ে এই ধরনের বীরত্বের পরিচয় দেওয়া মহামান্য দুর্যোধনের শোভা পায় না। দুর্যোধন দেখছি বীরত্বের নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করছেন! ধন্য, মহারাজ দুর্যোধন!'

ভীমের ব্যঙ্গের আক্রমণে দুর্যোধন নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। হ্রদের ভিতর থেকে এবার তিনি নিজেকে প্রকাশ করলেন। বললেন, 'আমি কাপুরুষ নই। আমি পালাইনি, এখানে একদিন শুধু বিশ্রাম করছি।'

ভীম ব্যঙ্গভরে উচ্চহাস্য করে উঠে বললেন, 'মহামান্য দুর্যোধন উপরে উঠে আসলে আমি তাকে চিরবিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেব।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'তুমি উপরে উঠে এস, দুর্যোধন। তোমাকে বীরের মতো আহ্বান করছি। তোমার প্রতি যাতে কোনো অন্যায় ব্যবহার করা না হয়, তার জন্য আমি কথা দিচ্ছি।'

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের কথায় দুর্যোধন উপরে উঠে এলেন। বললেন, 'আমি ক্ষত্রিয়, বীর। আমি বীরের মতো যুদ্ধ করতে চাই, কিন্তু আমার কাছে কোনো অস্ত্র বা বর্ম নেই।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমি তোমাকে সমস্তই দিচ্ছি। তুমি আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যে কোনো একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করো। যদি জয়ী হও, তবে কথা দিচ্ছি—তোমাকে সমস্ত রাজ্য দিয়ে আমরা বনে চলে যাব।'

শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, 'দুর্যোধন যদি নকুল কিংবা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তবে তো সর্বনাশ!'

ভীম গদা হাতে আস্ফালন করে উঠলেন। বললেন, 'তুমি কত বড় বীর সেটা আজ একবার পরীক্ষা হোক।'

দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমের শত্রুতা সেই বাল্যকাল থেকে। সেই

বাল্যকাল থেকেই দুর্যোধন আর ভীমের সংঘর্ষ চলে আসছে। দুর্যোধনের অন্তরে পুরানো হিংসা জেগে উঠল। উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'বেশ, তোমার সঙ্গেই যুদ্ধ করব আজ। আজ গদাযুদ্ধ হবে। কে প্রকৃত বীর—আজ তা প্রমাণিত হবে।'

দুর্যোধনের পছন্দমত বর্ম, গদা, পোশাক আনা হল। তারপর দ্বৈপায়ণ হ্রদের তীরে শুরু হল এক ভয়াবহ গদাযুদ্ধ।

গদা চালনায় দুর্যোধন নিপুণ ছিলেন, কিন্তু ভীমের ছিল প্রচুর দেহের শক্তি।

কখনো দুর্যোধন ভীমকে আঘাত করেন, কখনো ভীম আঘাত করেন দুর্যোধনকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুইজনে যুদ্ধ করে চললেন। উভয়ের দেহ গদার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ল। উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

কূটকৌশলী শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে পরাজিত করবার নতুন ফন্দী আঁটলেন। সেই ফন্দির কথা অর্জুনকে তিনি জানালেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ভীমকে জানিয়ে দিলেন দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করতে। গদাযুদ্ধে উরুতে আঘাত করা নিষিদ্ধ। তবু এপথ ছাড়া দুর্যোধনকে পরাজিত করার অন্য পথ ছিল না।

নতুন উদ্যমে ভীম দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন। ভীমের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য লাফিয়ে উঠলেন দুর্যোধন। এবার সুযোগ এল। দুর্যোধন লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভীম গদার প্রচণ্ড আঘাত হানলেন দুর্যোধনের উরুতে। দুর্যোধন ছিন্নমুল বৃক্ষের মতো লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে। ভাম উন্মাদ হয়ে দুর্যোধনকে পদাঘাত করতে থাকেন।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির ছুটে এলেন। ভীমকে ভর্ৎসনা করলেন, 'ছিঃ,

ছিঃ, ভীম! তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এবার ক্ষান্ত হও। পরাজিত মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে আঘাত করে চরম পাপী হোয়ো না।'

পরাজিত আহত দুর্যোধনের চোখে তখন অন্ধকার নেমে আসছে। ভগ্ন উরুর যাতনা নিয়ে তিনি তখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে মুমূর্ষু দুর্যোধন ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'শোন কৃষ্ণ, তুমি হীন, কূট, তুমি কংসের দাসের পুত্র। তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতে আজ আমার পরাজয় আর মৃত্যু।'

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুব্ধ না হয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার আজীবন কৃতকর্মের ফল তুমি ভোগ করলে।'

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও দুর্যোধন তাঁর কৃতকর্মের জন্য এতটুকু অনুতপ্ত হলেন না। অনমিতকণ্ঠে বললেন, 'যতদিন বেঁচেছি, রাজার মতো সুখ সম্পদ ভোগ করেছি। আজ আমি বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছি। এমন মৃত্যুই তো ক্ষত্রিয়ের কাম্য। আমার কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নেই। আমি এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই স্বর্গলাভ করতে চলেছি। তোমরা হাহাকার-ভরা শূন্য রাজ্যের এবার অধিপতি হও। তোমরা ভোগের পরিবর্তে দুর্ভোগই বেশী পাবে।'

দুর্যোধন মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল দুর্যোধনের মৃতদেহের উপর।

———

# সোনার হরিণ

স্নিগ্ধ গোদাবরী নদীর তীরে ছায়ামধুর পঞ্চবটী বনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা চোদ্দ বৎসর বনবাসে কাটাবেন বলে স্থির করলেন। কুটীর নির্মাণ করে দুই রাজপুত্র ও রাজবধূ আশ্রমবাসীর মতো সহজ সরল দিনযাপন করতে থাকেন। কোনো দুশ্চিন্তা বা দুঃখ তাঁদের জীবনকে স্পর্শ করতে পারে না।

কিন্তু সুন্দর নীল আকাশও মাঝে মাঝে মেঘে আবৃত হয়ে মলিন হয়। তেমনি এক দুর্যোগ নেমে এল শান্ত অরণ্য-জীবনে।

লঙ্কার রাজা রাবণ। তাঁরই প্রিয় ভগ্নী সূর্পনখা। লক্ষ্মণকে

সূর্পনখা নানাভাবে জ্বালাতন করত। একদিন লক্ষ্মণ দুষ্টা নারী সূর্পনখার নাক ও কান ধনুর্বাণের সাহায্যে কেটে ফেলেন।

অপমানিতা, আহতা সূর্পণখা রাবণের কাছে এসে কেঁদে পড়লেন! বললেন, 'দাদা, তোমাকে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হবে।'

রাবণ এক অভিনব ফন্দী আঁটলেন। উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে লক্ষ্মণকে।

তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মায়াবী মারীচকে সঙ্গে নিয়ে একদিন পঞ্চবটী বনে এসে উপস্থিত হলেন রাবণ। মারীচ জাদুবিদ্যার সাহায্যে সোনার হরিণে পরিণত হল এবং রামচন্দ্রের কুটীরের সম্মুখে ছোটাছুটি করতে লাগল।

এতদিন সীতা এই বনে আছেন, কিন্তু এমন সুন্দর সোনার হরিণ দেখেননি। তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সোনার হরিণ পুষবার ইচ্ছা জাগল সীতার মনে। সীতা রামের কাছে অনুরোধ জানালেন, 'আমাকে ঐ সুন্দর সোনার হরিণটি এনে দাও।'

রামচন্দ্র হরিণটিকে ধরবার জন্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না! হরিণটির পিছনে ছুটতে ছুটতে তিনি অনেক দূর চলে গেলেন। অবশেষে তিনি সোনার হরিণটিকে হত্যা করবার সংকল্প করলেন। তীর দিয়ে সোনার হরিণটিকে রাম যখন মারতে যাবেন, তখন হরিণটি আর্তনাদ করে উঠল, 'ও ভাই লক্ষ্মণ, তুমি কোথায়? শীঘ্র এসো, আমি মারা গেলাম।'

সীতা ও লক্ষ্মণ কুটীর থেকে সেই আর্তনাদ শুনলেন। সীতা মনে করলেন, স্বামী রামচন্দ্র বিপদাপন্ন হয়ে এমন আর্তনাদ করছেন। আর্তনাদ শুনে লক্ষ্মণ প্রথমে চমকে উঠলেও পরে বুঝলেন, তাঁর ভাই রামচন্দ্র বিপদে পড়তে পারেন না। কিন্তু সীতার পীড়াপীড়ি ও ভর্ৎসনার জন্য লক্ষ্মণ যেতে সম্মত হলেন।

কুটীরের প্রাঙ্গনে একটা রেখা টানলেন লক্ষ্মণ। সীতাদেবী

কোনোপ্রকারেই যেন এই চিহ্নিত প্রাঙ্গনের বাইরে না যান—এমন নির্দেশ দিয়ে, লক্ষ্মণ হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে অগ্রজের সন্ধানে বের হলেন। সীতা সেই বনে কুটীরের মধ্যে একা রইলেন।

দুরভিসন্ধি নিয়ে রাবণ এমন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। এক সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি এসে উপস্থিত হলেন সেই কুটীরের সম্মুখে। সীতা সাধুরূপী রাবণকে চিহ্নিত সীমানার মধ্যে এসে ভিক্ষা নিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সাধুরূপী রাবণ অসম্মত হয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন। ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দেওয়া অপরাধ। তাই সীতা সহজ সরল মনে চিহ্নিত সীমার বাইরে এসে ভিক্ষা দিতে গেলেন। অমনি রাবণ স্বমূর্তি ধারণ করে সীতাকে অপহরণ করে পুষ্পক রথে আরোহণ করলেন।

অবাস্তব মায়াবী সোনার হরিণের জন্যই পঞ্চবটীর এক আনন্দময় পরিবারে নিয়ে এল দুঃখের অন্ধকার। শুরু হল পাপাত্মা রাবণের সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণের রক্তক্ষয়ী সর্বনাশা সংগ্রাম।

---

# তরুণ পণ্ডিত

পূর্ব বাংলার এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের সন্তান। অল্পবয়সেই অতুল ধন-সম্পদ ত্যাগ করে জ্ঞানলাভের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এসে পড়লেন নালন্দায়। নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ তখন ধর্মপাল। তাঁর কাছে ধর্মের ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হলেন এই তরুণ। ধর্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। তরুণ বয়সেই হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী হলেন।

একবার ভারতের দক্ষিণ দেশ থেকে পাটলিপুত্রে এলেন এক হিন্দু পণ্ডিত। ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতকে তিনি তর্কে পরাজিত করে অহংকারী হয়ে ওঠেন। এই হিন্দু পণ্ডিত বৌদ্ধ পণ্ডিতদের

তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। ধর্মপাল সেই আহ্বান গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য বাঙালী তরুণ ধর্মপালকে তর্কসভায় না যেতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, 'গুরুদেব, আমাকে তর্কসভায় যেতে অনুমতি দিন। আপনার শ্রীচরণে বসে এতদিন যে জ্ঞানলাভ করেছি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে সেই জ্ঞানের সাহায্যেই পরাজিত করতে পারব।'

কিন্তু ধর্মপালের মনে সংশয়, দ্বিধা। ভারতবর্ষের সব পণ্ডিত যাঁর কাছে পরাজিত, তাঁকে পরাজিত করবে এই তরুণ! তিনি শিষ্যকে সস্নেহে বললেন, 'তুমি তো তর্ক সমন্ধে অভিজ্ঞ নও, বৎস! তবে তুমি কিভাবে সেই পণ্ডিতকে পরাস্ত করবে? তুমি ক্ষান্ত হও।'

তরুণের বুকে দুর্জয় সাহস, নিজের উপর গভীর বিশ্বাস। শান্তস্বরে তরুণ বললেন, 'আপনি যেভাবে অন্যের মত খণ্ডন করতে শিখিয়েছিলেন, আমি সেই ভাবেই আত্মাভিমানী পণ্ডিতকে পরাস্ত করব। তা ছাড়া আমি যে সব প্রশ্ন করব, তার উত্তর দেওয়া সেই পণ্ডিতের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে বলেই মনে করি। আপনার আশীর্বাদ থাকলে যে কোনো কঠিন কাজে আমি অগ্রসর হতে পারি, গুরুদেব।' তরুণ ধর্মপালের চরণে প্রণত হলেন।

ধর্মপাল শিষ্যের সৎসাহস, গভীর আগ্রহ দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। তিনি শিষ্যের উজ্জ্বল মুখে এক জ্ঞানের জ্যোতি দেখলেন।

তরুণ বললেন, 'আমি একজন ছাত্র। আমি পরাজিত হলে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পরাজিত হবেন না। আমার পরাজয়ে নালন্দার ছাত্রদেরই কেবল মাত্র পরাজয় হবে, আপনাদের বিচলিত হবার কারণ নেই। আমি যদি পরাজিত হই তবে আপনি যাবেন।'

ধর্মপাল সম্মত হলেন। তিনি তরুণকে একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন। তাতে লেখা ছিল : 'আমি একজন ছাত্রকে পাঠালাম। এই ছাত্র পরাজিত হলে আমি তর্কসভায় যাব।'

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নালন্দার একজন ছাত্রকে দেখে অট্টহাসি হাসলেন। বৌদ্ধদের সম্বন্ধে তিনি নানারকম ব্যঙ্গ করলেন। বিদ্রূপ করে বললেন, 'একজন বালক আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছে ? বৌদ্ধরা নিতান্তই পাগল দেখছি। ওহে বালক, তুমি ফিরে গিয়ে তোমার অধ্যাপকদের পাঠিয়ে দাও।'

তরুণ ছাত্রটি হেসে বললেন, 'আপনি বয়সে বড়, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আগে আপনি আমাকে পরাজিত করুন, তবে প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে তর্কে ব্রতী হবেন।'

দক্ষিণ দেশের অহংকারী পণ্ডিত মুচকি হেসে বালকের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। প্রথমে তিনি কতকগুলি জটিল প্রশ্ন করলেন। তরুণটি শান্ত ও গম্ভীর হয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। উত্তেজিত হয়ে উঠলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন। অবিচলিত চিত্তে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সভায় প্রতিটি মানুষকে স্তম্ভিত করলেন। দক্ষিণ দেশের পণ্ডিত তরুণের অসাধারণ জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন।

এবার তরুণের প্রশ্নের সময়। মাত্র তিনটি প্রশ্ন করলেন তিনি। পণ্ডিত প্রবর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় অবান্তর কথা বলতে লাগলেন। সভাস্থ জনমণ্ডলী তরুণের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। সামান্য একজন তরুণের নিকট পরাজয় স্বীকার করলেন এতদিনের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। পরাজিত হয়ে পণ্ডিত বললেন, স্ত্রী-পুরুষভেদে তার বয়সের সঙ্গে গুণের কোন সম্বন্ধ নেই। গুণই প্রধান। একজন

বৌদ্ধ ছাত্রের যখন এত জ্ঞান, তখন বৌদ্ধ অধ্যাপকের জ্ঞান না জানি কতখানি!'

মগধের নরপতি তরুণের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে প্রচুর ধন-সম্পদ দিতে চাইলেন। তরুণ বললেন 'আমি ভিক্ষু শ্রমণ। ধনে আমার প্রয়োজন নেই। পিতার ধন-সম্পদ ত্যাগ করেই আমি জ্ঞানের সাধনায় বেরিয়ে পড়েছি। আপনি নালন্দা মঠে ঐ সব ধন-সম্পদ দান করুন।'

মহারাজ তরুণের নির্দেশ পালন করলেন। তিনি নালন্দায় তরুণের বিজয়-বার্তা জানাবার জন্য একজন দূত পাঠালেন।

নালন্দার এই বাঙালী তরুণের নাম শীলভদ্র। ইনি ধর্মপালের পর নালন্দার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। এঁর সময়েই নালন্দার খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হয়।

---

# প্রতিভাধর ছাত্র

গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ। পাঠশালার গুরুমহাশয় ঠাকুরদাসকে বললেন, "এ বালক ভবিষ্যতে গুণী লোক হবে।"

ঠাকুরদাস পুত্রকে নিয়ে কোলকাতা চললেন। বালকের বয়স তখন নয় বৎসর। চলতে চলতে পথের পাশে দূরত্বজ্ঞাপক শিলাখণ্ড দেখে বালক কৌতূহলী হয়ে উঠল। পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে সে, "বাবা, বাটনা বাটা শিলের মতো ওটা কি?" পুত্রের কথায় পিতা হেসে উঠলেন। বললেন, "ওটা মাইলের চিহ্ন। ওই পাথরটায় ইংরেজি অক্ষরে উনিশ লেখা আছে। এখান থেকে উনিশ মাইল গেলে আমরা কোলকাতা পৌঁছাব।"

বালকের আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। সে মনে মনে ইংরেজি এক আর নয় সংখ্যাটি শিখে নিল। পরবর্তী মাইলের চিহ্ন এলে সে শিখল আট সংখ্যাটি, এইভাবে চলতে চলতে বালকটি ইংরেজি হরফের সংখ্যাগুলি চিনে নিল। ইংরেজি এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা তার মনে গাঁথা হয়ে গেল। কোলকাতা পৌঁছে বালকটি পিতাকে বলল, "বাবা, আমি ইংরেজি সংখ্যাগুলো শিখে ফেলেছি। সংখ্যাগুলো এখন আমি লিখতে পারি।"

পিতা ঠাকুরদাস বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন। পুত্রকে পরীক্ষা করলেন পিতা। একটি যোগ অংক করতে দিলেন তিনি। বালকটি সহজেই অংকটি কষে দিল। পুত্রের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এই বালকটিই প্রাতঃস্মরণীয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রকে ভর্তি করা হল। কোলকাতার

বাসার সমস্ত কাজকর্ম ঈশ্বরচন্দ্রই করতেন। এমন কি রন্ধন-কার্যও তাঁকে করতে হত। সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করে গভীর রাতে তিনি পাঠাভ্যাস করতেন। রান্নার সময় উনুনের আলোতেও তিনি পড়াশুনা করতেন।

বারো বৎসর বয়সে তিনি ব্যাকরণের পাঠ শেষ করলেন। কাব্য শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট উপনীত হলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কঠিন প্রশ্নগুলোর উত্তর অতি সহজেই দিলে পণ্ডিতমহাশয় কাব্য-শ্রেণীতে আগ্রহের সঙ্গেই তাঁকে ভর্তি করে নিলেন।

সংস্কৃত কাব্যসকল ঈশ্বরচন্দ্র মুখস্থ করে ফেললেন। কাব্যের পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন। বর্ণাশুদ্ধি না ঘটায় এবং সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পুরস্কার লাভ করলেন।

এরপর তিনি অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতিটি বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অধ্যাপকগণ তাঁকে "বিদ্যাসাগর" উপাধিতে ভূষিত করেন। বিদ্যাসাগর বললে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝি।

পাঠশালার গুরুমহাশয় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হয়েছিল।

---